স্বর্ণমুকুট

গোপেন্দ্র বসু

নবীগোপাল চট্টোপাধ্যায় এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
১।১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন :: কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ
মার্চ ১৯৬২

প্রচ্ছদ ও চিত্রসজ্জা
সুধীন ভট্টাচার্য

ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং

মূল্য : ২·৫০

নবীগোপাল চট্টোপাধ্যায় এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষ হইতে শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীনীলরতন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক জ্ঞানোদয় প্রেস, ১৭ হায়াৎ খাঁ লেন, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত।

শ্রীবেলারানী বসুকে

।। প্রথম পরিচ্ছেদ ।।

সকাল সাতটা পঁয়তাল্লিশ।

পুরী এক্সপ্রেস হাওড়া স্টেশনে পৌঁছতেই এগারো নম্বর প্লাটফরম সরগবম হয়ে উঠলো। গাড়িখানা এখনও থামে নি, আরোহীরা নামবার জন্যে তৈরী হচ্ছে। স্টেশনের কুলিরা গাড়ির মধ্যের মোটের দিকে দৃষ্টি রেখে সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে আট দশজন,—কেউ কেউ ইতিমধ্যে চলন্ত গাড়ির পাদানীতে উঠে পড়েছে। রাত্রিজাগা ও দীর্ঘসময় গাড়ির কামরার মধ্যে আবদ্ধ থাকায় আরোহীদের বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। প্লাটফরমের মধ্যে গাড়িখানা আস্তে আস্তে কিছু দূর গিয়ে একেবারে থেমে গেল।

সেকেণ্ড ক্লাস কামরা থেকে বুলেট একটা চামড়ার স্যুটকেশ ও বেডিং নিয়ে নামতেই দুজন কুলি তার কাছে ছুটে এসে সেলাম করলে। বুলেট কিন্তু নিজেই মোট দুটো বয়ে নিয়ে চললো। প্লাটফরমের মাঝামাঝি আসতে দূর থেকে বজ্রকে দেখতে পেয়ে জোর গলায় ডাকলে, "বজ্র!"

বজ্র বুলেটের জন্যেই স্টেশনে এসেছিল; সে ছুটে এসে বুলেটের

হাত থেকে বেডিংটা নিয়ে বললে, "যাক্, তুমি ঠিক সময় এসে গেছ, পুরীর গাড়ি এক-একদিন লেট করে। চল, স্টেশনের বাইরে বোমা .তার মোটর নিয়ে অপেক্ষা করছে।"

স্টেশনের সামনে বড় রাস্তার ওপর মোটরে বোমা বোধ হয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। তার আর অপরাধ কি! কদিন যা পরিশ্রম যাচ্ছে—দিনে, রাতে। বুলেট ও বজ্র স্টেশন থেকে বের হলো। কিছু দূরে দেখা যায় বোমার গাড়ি। বজ্র ডাকলে, "বোমা, বোমা!"

একদল ট্রেনযাত্রী সেইখান দিয়ে স্টেশনে ঢুকছিল। 'বোমা' কথাটা কানে যেতেই তারা হকচকিয়ে যায়। চারিদিকে তাকায়—চোখে আতঙ্ক। বুলেট তাদের মানসিক অবস্থা বুঝতে পারে, বলে, "কিছু মনে করবেন না আপনারা। আমাদের যে বন্ধুটি ঐ মোটরে বসে আছে, তাব নাম 'বোমা', আমরা তাকে ডাকছি।"

বোমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, সে তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে বের হয়ে বললে, "কে, বুলেট! এসেছ? বজ্রকে নিয়ে তুমি গাড়ির মধ্যে এসে বস, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আসছি।"

'বুলেট' 'বজ্র' 'বোমা'!

ট্রেনযাত্রীদের মধ্যে গুঞ্জন উঠলো। একজন বললে, "আচ্ছা সব নামই বটে! বুলেট, বজ্র, বোমা—হুঁ!"

আর একজন মন্তব্য করলে, "তা যাই বলুন, ঐরকম নামই কিন্তু ওদের মানায়। দেখছেন না, বয়সে তরুণ বটে, কিন্তু কি সুন্দর মাস্কুলার স্বাস্থ্য প্রত্যেকের!"

তারা চলে গেল।

বোমা চোখমুখ ধুয়ে এসে স্টীয়ারিংয়ের সামনে বসে গাড়ি স্টার্ট দিলে।

হাওড়া পুলের ওপর দিয়ে গাড়ি চলেছে। বুলেট বজ্রকে জিজ্ঞাসা করলে, "তারপর কি খবর বল তো? হঠাৎ জরুরী তার কি জন্যে?"

বুলেট আরও কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বজ্রের দিকে ভালো করে

লক্ষ্য করতেই সে চুপ করে গেল। মোটে দশ দিন ওকে দেখে নি। কিন্তু তারই মধ্যে বজ্রের চেহারা—মুখ চোখ—যেন শুকিয়ে গেছে। মনে হয়, গুরুতর কোন বিপদ ঘটেছে। মাথার চুল এলোমেলো, পরনের হাফপ্যাণ্ট-সার্ট বা জুতা-মোজার অবস্থা অপরিষ্কার, শোচনীয়। আর বোমা তো গোড়া থেকেই চুপচাপ—নীরবে ধীরে ধীরে গাড়ি চালিয়ে চলেছে।

বুলেট বিস্মিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলে, "কি ব্যাপাব বল তো? তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে, কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে।"

গাড়িখানা হাওড়ার পুল পার হয়ে স্ট্রাণ্ড রোডে পড়লো। বজ্র বললে, "আমাদের 'শক্তি-সংঘে'র সম্পাদক বীরেনদাকে আজ চারদিন হলো পাওয়া যাচ্ছে না। গেল রবিবার সন্ধ্যায় শক্তি-সংঘের লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা হলো, তারপর মিটিং শেষ হতে প্রায় আটটা। মিটিং হয়ে গেলে বীরেনদা তাঁর টু-সীটার গাড়ি করে চলে গেলেন। আমরা শক্তি-সংঘেব ছেলে-মেয়েরাও বাড়ি ফিরলাম। বাড়িতে সেদিন বেশী রাত পর্যন্ত লেখাপড়া কবে সবে শুয়েছি, রাত প্রায় সাড়ে বারোটার সময় বীরেনদার বাড়িব দরোয়ান ও ভানু চাকর এসে আমাকে ঘুম ভাঙিয়ে তুলে জিজ্ঞাসা করলে—বীবেনদার কোন খবর জানি কিনা। আমি বললাম, 'রাত আটটার পর বীরেনদার কোন খবর জানি না। কেন তাঁর কি হয়েছে?' ভানু যা বললে তা থেকে জানতে পারলাম—বীরেনদা বাড়ি ফিরে তাঁর বৈঠকখানায় বসবার পরই একজন ভদ্রলোক একখানা মোটর করে এসে তাঁকে জানায় যে, বীরেনদার বন্ধু এটর্নি অমিতাভ সেনের হঠাৎ খুব বাড়াবাড়ি অসুখ হয়েছে, অমিতাভ বাবু সেই ভদ্রলোককে পাঠিয়েছেন, বীরেনদাকে তক্ষনি তাঁর বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে। বীরেনদা জানতেন, অমিতাভ সেনের বাড়িতে সেবা-শুশ্রূষা করার মত কোন লোক নেই, সেইজন্যে তিনি একজন নার্সকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আগন্তুক ভদ্রলোকটি কিছুতেই এজন্যে অপেক্ষা করতে রাজী হলেন না।

বীরেনদা তখন অমিতাভ বাবুর বাড়িতে নার্সকে নিয়ে যাবার ভার ভানুর ওপর দিয়ে সেই ভদ্রলোকটির সঙ্গে চলে গেলেন।

"রাত প্রায় দশটায় ভানু সেই নার্সকে নিয়ে একটা ট্যাক্সি করে অমিতাভ বাবুর বরানগরের বাড়িতে গিয়ে দেখলে, অমিতাভ বাবুর কিছুই হয় নি, তিনি সুস্থ আছেন। তিনি বললেন, বীরেনদাকে আনবার জন্যে সেদিন তিনি কাউকে পাঠান নি। বীরেনদাকে যে ভদ্রলোক মোটরে করে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ সাধুর মতন। সেই সাধু যে বীরেনদাকে কোথায় এবং কি কারণে নিয়ে গেলেন, তা গভীর রহস্যাবৃত। খবরটা জানবার পব থেকেই আমরা শক্তি-সংঘের ছেলে-মেয়েরা সবাই কত চেষ্টা করছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত বীরেনদার কোন সন্ধানই পাই নি, পুলিসও তাঁর কোন খবর দিতে পারছে না।"

গাড়িখানা ভবানীপুরের কাছাকাছি এসে গিয়েছিল। বুলেট সব কথা শুনে বিশেষ উদ্বিগ্নকণ্ঠে বজ্রকে জিজ্ঞাসা করলে, "পুলিসের এবিষয়ে কি ধারণা ? তারা কি বলে ?"

বজ্র উত্তর দিলে, "পুলিস বলে, কেসটি 'কিডন্যাপিং ফর র‍্যানসম্' অর্থাৎ টাকা আদায়ের জন্যে কেউ বা কোন গুপ্ত দল বীরেনদাকে চুরি করে গুম্ করে রেখেছে। সম্প্রতি এই রকম কেস নাকি দু-চারটা এদেশে হচ্ছে। কিন্তু একাজটা ঠিক কাদের দ্বারা হয়েছে, পুলিস তা এখনও স্থির করতে পারেনি। তবে তাদের ধাবণা, বীরেনদার হরণকারীরা খুব বুদ্ধিমান ও সাংঘাতিক প্রকৃতির লোক।"

কিছুক্ষণ চিন্তা করে বুলেট বললে, "কিন্তু ঐ রকম দলের লোকেরা বড়লোকদের ছেলে কি মেয়ে চুরি করে নিয়ে যাবার দু-একদিন পরেই হরণ-করা ছেলে বা মেয়ের অভিভাবকের কাছে চিঠি দিয়ে বা অন্য প্রকারে খবর দেয় যে, অমুক জায়গায় এই সময় এত পরিমাণ টাকা যদি পাঠিয়ে দেওয়া হয় তো তার হারানো ছেলে কি মেয়েকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। যদি তাদের কথা ঠিক মত মানা না হয় বা তাদের কোন ক্ষতি করবার চেষ্টা করা হয়, তাহলে অপহৃতকে হত্যা করা হবে।"

বোমার গাড়িখানা চৌরঙ্গী রোড ছেড়ে এলগিন রোডে ঢুকলো।

বুলেট আবাব বজ্রকে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা, সেই রকম কোন চিঠি বা খবর বীরেনদার বাড়িতে এসেছে কি?"

বোমা আজ খুব সকালে বীরেন রায়ের বাড়িতে গিয়েছিল, সে উত্তর দিলে, "না, ও রকম কোন খবর আজ সকাল পর্যন্ত বীরেনদার বাড়িতে আসে নি। বীবেনদার সেই আধপাগলা বিলাতফেরত মামা ব্যাঙ্ক থেকে দশ হাজাব টাকা তুলে নিয়ে এই রকম খবরের জন্যে অপেক্ষা করছেন।"

বুলেট এবার আরও উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললে, "চার দিন হলো, বীরেনদাকে হরণ করা হয়েছে, অথচ এখনও ঐরকম কোন খবরই এলো না। মনে হচ্ছে, এটা তাহলে সেই জাতীয় সাধারণ কিডন্যাপিং কেস নয়, আরও কিছু সাংঘাতিক ব্যাপার এর মধ্যে আছে। যারা বীরেনদাকে হরণ করেছে, তারা বোধহয় টাকা চায় না, চায় বীরেনদার জীবন।"

বজ্র ও বোমা এ কথায় চম্‌কে উঠলো।

বজ্র বিস্মিত হয়ে বললে, "বীরেনদার মতো নির্বিবাদী বিদ্বান লোকের এমন কোন্ শত্রু থাকতে পারে, যে তাঁর জীবন চাইবে?"

বুলেট উত্তর দিলে, "অতি সাধু সজ্জন ব্যক্তিরও শত্রু থাকতে পারে।"

বজ্র বললে, "ধর, বীরেনদার যদি অদৃশ্য শত্রু থাকেও, সে কি উদ্দেশ্যে তাঁকে হরণ করলে?"

বুলেট উত্তর দিলে, "সেইটাই আমাদের আবিষ্কার করতে হবে।"

ল্যান্সডাউন রোডে গাড়িটা আসতে বুলেট বোমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "গাড়ি এখন যাচ্ছে কোথায়?"

বোমা উত্তর দিলে, "কেন, তোমাদের বাড়িতে।"

বুলেট বললে, "না, চল সানি-পার্কে 'রায়ভিলা'য়—বীরেনদার বাড়িতে।"

বজ্র বললে, "এখনি সেখানে যাবে? সারারাত ধরে ট্রেনে এলে, ঘুম ভালো হয় নি নিশ্চয়ই, এখন তোমার দরকার কিছু বিশ্রাম—"

বজ্রের কথায় বুলেট বাধা দিলে, "বিশ্রামের কথা আমাদের এখন ভুলতে হবে, যতদিন না বীরেনদা উদ্ধার পাচ্ছেন।"

... ...

সানি-পার্কের 'রায়ভিলা' সাবেক বালিগঞ্জের অভিজাত পল্লীর মধ্যে একটি বিখ্যাত বাড়ি।

বেলা প্রায় নটা। রায়ভিলায় পুলিশের বড় বড় অফিসার চার-পাঁচজন এসেছেন। তার মধ্যে আছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিস কমিশনার রায় সাহেব পি. এন. চৌধুরী আর ভবানীপুর ও বালিগঞ্জ থানার ইন্স্‌পেক্টর দুজন। সকলেরই ইউনিফরম পরা; একজনের পরনেই কেবল সাদা বাঙালী পোশাক। তিনি বোধহয় আই. বি. অর্থাৎ গুপ্ত পুলিসের কোন বড় অফিসার।

'রায়ভিলা'র বৈঠকখানায় লোক ভর্তি, গেটে ও বাড়ির সর্বত্র লাল-পাগড়িধারী পুলিস দাঁড়িয়ে আছে। কেসটি সম্পর্কে পুলিস কর্তৃপক্ষের পূর্বে যে ধারণা হয়েছিল, তার কিছু পরিবর্তন হয়েছে। সেইজন্যে আবার তাঁরা নতুন করে অনুসন্ধান বা এন্‌কোয়ারী আরম্ভ করেছেন।

বৈঠকখানায় বীরেন রায়ের আধপাগলা বিলাতফেরত মামা মিস্টার মিত্র একটি কৌচে বসে পাইপ টানছেন। এই প্রথম তাঁকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। তাঁর পাশে একটি চেয়ারে বীরেন রায়ের বন্ধু এটর্নি অমিতাভ সেন। টেবিলের সামনের চেয়ারগুলিতে পুলিস অফিসাররা বসে। তাঁরা নিজেদের মধ্যে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত।

'রায়ভিলা'র চাকর দরোয়ান ড্রাইভার ঘরের সামনের বারান্দায় চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

বুলেট ও বজ্র এসে ঘরের কোণে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়লো। রায় সাহেব তাদের দিকে চাইতেই অমিতাভ সেন বুলেট ও বজ্রের পরিচয় জানালেন তাঁকে।

বীরেন রায়ের অপহরণের বিষয় এ বাড়ির কে কতটা জানে, তা জানবার ও নোট করবার জন্যে রায় সাহেব এইবার প্রস্তুত হলেন।

প্রথমে বীরেন রায়ের চাকর ভানু বলতে আরম্ভ করলে :

"গেল রবিবার রাত আটটা নাগাদ দাদাবাবু অর্থাৎ বীরেন বাবু তাঁর ছোট গাড়ি করে ফিরে এসে এই ঘরে বসে সবে সেদিনকার চিঠিপত্র দেখছেন, এমন সময় একখানা মোটর গেট পেরিয়ে হাতাতে এসে থামলো। সঙ্গে সঙ্গে একটি ভদ্রলোক সেই মোটর থেকে নেমে সোজা এই ঘরে ঢুকলেন। আমি তখন এই ঘরেই ছিলুম। দাদাবাবু ভদ্রলোকটির দিকে চাইতেই তিনি জানালেন যে, তিনি দাদাবাবুর বন্ধু অমিতাভ বাবুর বাড়ি থেকে আসছেন। অমিতাভ বাবুর থ্রম্বসিস্ না কি একটা সাংঘাতিক রোগ হয়েছে, তিনি দাদাবাবুকে এক্ষনি চান। ভদ্রলোকটির কথায় দাদাবাবু ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, বললেন., 'অমিতাভের অসুখ ! নিশ্চয়ই আমাকে যেতে হবে—এক্ষনি যাব। আর সঙ্গে এক-জন নার্সকেও নিয়ে যাব। অমিতাভের বাড়িতে নার্স করবার কেউ নেই।' মামাবাবুর অসুখের সময় যে নার্স এ বাড়িতে আসতো, দাদাবাবু তার হোস্টেলে ফোন করে জানলেন, সে তখনও ফেরে নি, ফিরবে এক ঘণ্টা পরে। দাদাবাবু তার জন্যে অপেক্ষা করতে চাইলেন, কিন্তু ভদ্রলোকটি রাজী হলেন না, বললেন, 'নার্স নয় পরে যাবে, আপনি এক্ষনি চলুন, আপনি না যাওয়া পর্যন্ত ভালো রকম চিকিৎসা আরম্ভ হবে না। কি রকম চিকিৎসা হবে, কোন্ ডাক্তারকে ডাকা হবে, তা আপনার সঙ্গে পরামর্শ না করে কিছু করতে পারছি নে। অমিতাভের অভিভাবক বলে তো কেউ নেই।' দাদাবাবু একটু ভেবে বললেন, 'আচ্ছা, নার্স পরে ভানুর সঙ্গে যাবে। যাবার পথে ভানুকে নার্সের হোস্টেলে আপনার গাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যাব।' ভদ্রলোকটি বললেন, 'জগুবাবুর বাজারের কাছে আমার একটা দরকার আছে, আমি ভবানীপুর হয়ে যাব।' "দাদাবাবু বললেন, 'তাহলে তো ভালোই হলো। নার্সের বাড়ি জগুবাবুর বাজারের কাছেই। ওখানে গিয়ে আপনি আপনার কাজ সেরে নেবেন, ইতিমধ্যে আমি ভানুকে সঙ্গে করে নার্সের হোস্টেলে গিয়ে তার যাবার ব্যবস্থা

করে আসবো। এজন্যে আমার পনেরো মিনিটের বেশী সময় লাগবে না।'

"আমরা সেই ভদ্রলোকের গাড়ি করে জগুবাবুর বাজারের পিছনে মোহিনীমোহন রোডে এসে থামলুম। দাদাবাবু ও আমি গাড়ি থেকে নাবতেই, সেই ভদ্রলোক দাদাবাবুকে বললেন, 'আপনি তো মিনিট পনেরো পরে আসছেন। আপনি এসে ঠিক এইখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন। আমার একটু দেরি হতে পারে—আইস্-ব্যাগ, হট-ওয়াটার বট্‌ল্, আরো দু-একটা জিনিস কিনতে হবে।'

"সেদিন মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছিল। দাদাবাবু ও আমি নার্সের বাড়ির দিকে কিছু দূর যাবার পর দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে শুরু করলে। দাদাবাবু বললেন, 'ভানু, বৃষ্টি বোধ হয় জোর হবে, ওয়াটার প্রুফ্‌টা মোটরে রেখে এলুম, তুই ছুটে গিয়ে নিয়ে আয়, আমি নার্সের হোস্টেলে থাকছি। মোটেই দেরি করিস নি।' দাদাবাবু তাড়াতাড়ি চলে গেলেন, আমি প্রায় ছুটে মোহিনীমোহন রোডে এসে দেখি, সেই গাড়িখানা যেখানে ছিল সেখানে নেই। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করার পর দেখতে পেলুম, গাড়িটা কিছু দূরে একটা গলির মধ্যে একটা মোটর কারখানার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। গলিটা অল্প অল্প অন্ধকার। ঐখানে সেই ভদ্রলোক অর্থাৎ যিনি আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি একটা হিন্দুস্থানীর সঙ্গে কথা বলছেন, আর আমাদের বয়সী একটি ছেলে, দু হাতে দুটো পেট্রলের টিন এনে সেই গাড়িতে রাখছে। আমি ওদের কিছু না বলে হুডের ওপর থেকে দাদাবাবুর ওয়াটার প্রুফ্‌টা নিয়ে নার্সের বাড়ি গেলুম। দাদাবাবু সেখানে ছিলেন, তিনি বললেন, 'মিস্ সরকার এখনও আসেন নি, আমি একটা চিঠি লিখে রেখে যাচ্ছি। তিনি এলে তাঁকে নিয়ে একটা ট্যাক্সি করে অমিতাভের ওখানে যাবি, আমি ওখানে থাকবো।' দাদাবাবু আমাকে দুখানা দশ টাকার নোট দিয়ে চলে গেলেন।

"বরানগর ডানলপ ব্রীজের কাছে অমিতাভ বাবুর বাড়ি আমি

চিনি। দাদাবাবু চলে যাবার প্রায় এক ঘণ্টা পরে আমি নার্সকে ট্যাক্সি করে সেখানে নিয়ে গিয়ে দেখলুম, অমিতাভ বাবুর কিছুই হয় নি, তিনি ভালোই আছেন আর দাদাবাবুও সেখানে যান নি। অমিতাভ বাবু সব শুনে খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন, বললেন, 'বীরেন কি তাহলে কোন বদমাইশ লোকের পাল্লায় পড়লো?' তিনি তক্ষনি কোথায় কোথায় তিন-চার জায়গায় ফোন করলেন। আমাদের ট্যাক্সিতে সোজা লালবাজার পুলিস অফিসে এসে ডাইরি করে আমাকে ও নার্সকে বাড়ি পৌঁছে দিলেন, মামাবাবুকেও সেই রাত্রে সব কথা জানিয়ে চলে গেলেন। সেই রাত্রেই আমি ও দরোয়ান দেউকীনন্দন দাদাবাবুর ক্লাব, ক্লাবের ছেলেমেয়েদের ও তাঁর সব আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে খোঁজ নিলুম, কিন্তু কেউই দাদাবাবুর কোন সন্ধান দিতে পারলে না। এর পর আমি আর কিছুই জানি নে।" ভানু থামলো।

যে পুলিস অফিসার ভানুর কথাগুলি নোট করছিলেন, তিনি ভানুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, যে ভদ্রলোক তোমার দাদাবাবুকে মোটরে করে নিয়ে গিয়েছিল, তাকে দেখতে কেমন, আর তার বয়স কত, বলতে পার?"

ভানু উত্তর দিলে, "লোকটি দেখতে সাধু-সন্ন্যাসীর মতো; হলদে রংয়ের জামাকাপড় পরা, মাথায় বড় বড় চুল, মুখে দাড়িগোঁফ, চোখে কালো চশমা। কিন্তু ঠিক কত বয়েস তা বলতে পারি নে, তবে দাদাবাবুর চেয়ে অনেক বড় কিন্তু বুড়ো নয়—বেশ জোয়ান, নিজেই মোটর চালায়।" ভানুর বক্তব্য শেষ হলো।

রায়ভিলার আবহাওয়া থমথম করছে।

ভানুর পর রায়ভিলার দরোয়ান দেউকীনন্দন ও ড্রাইভার সন্তোখ সিং-কে ডাকা হলো—তারা সেদিন কি দেখেছে, বলার জন্যে। কিন্তু তারা বিশেষ কিছু দেখে নি বা জানে না, তবে তারা দেখেছে রাত নটা নাগাদ একজন সাধুর সঙ্গে দাদাবাবু ও ভানুকে মোটরে উঠে চলে

যেতে। সাধুর চেহারার বিষয় তারা যা বললে, তা ভানুর বর্ণনার সঙ্গে মিলে গেল। আর বেশী কিছু তারা বলতে পারলে না।

দেউকীনন্দনের ধারণা, সেই লোকটা শিখ। কিন্তু সন্তোখ সিং প্রতিবাদ করে বললে, "শিখদের হাতে বালা থাকে, সঙ্গে একটা কিছু অস্ত্রও থাকে, কিন্তু লোকটির তাব কিছুই ছিল না। ও বাঙালী।"

সেই পুলিস অফিসারটি এদের ছুজনের বক্তব্যই নোট করে নিলেন।

রায়ভিলার একটি উর্দি-পরা বেয়ারা একটি বড় ট্রেতে করে দশ-বারো কাপ চা ও সিগারেট দিয়ে গেল। চা খাবার পর বীরেন রায়ের বন্ধু অমিতাভ সেন বলতে আবস্ত করলেন ঃ

"আমি কলকাতা হাইকোর্টের একজন সলিসিটার। অপহৃত বীরেন্দ্রনারায়ণ রায় ও আমি বহুদিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু। ছুজনে এক সঙ্গে এক কলেজ থেকে আই-এসসি ও বি-এসসি পাস করেছি। তারপর বীরেন বিলাতে ডাক্তারী পড়তে যান, আমি ল কলেজে ভর্তি হই। বীরেন রায় ছিলেন কলেজের আদর্শ ছাত্র—শুধু লেখাপড়ায় নয়, তাঁর স্বাস্থ্য-স্বভাব ছিল উৎকৃষ্ট, স্পোর্টস্ বা খেলাধুলায় তিনি ছিলেন কলেজের মধ্যে অদ্বিতীয়, ইণ্টার-কলেজিয়েট বক্সিংয়ে তিনি ছাত্রজীবনে চ্যাম্পিয়ান হন। অন্য ব্যায়ামও তিনি করতেন। দেশের ছেলেমেয়েদের শরীর ও মন যাতে বলিষ্ঠ ও উন্নত হয়, সেই উদ্দেশ্যে তিনি নিজের বহু অর্থব্যয়ে এই বালিগঞ্জে 'শক্তি-সংঘ' প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই সংঘ কোন রাজনৈতিক মতের বা দলের নয়—যে কোন ছেলেমেয়ে এর মেম্বার হতে পারে। এই সংঘের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এই সংঘের ছেলে বা মেয়ে-মেম্বারদের একটি করে নামকরণ করা হয়—যেমন 'বুলেট', 'বজ্র', 'লক্ষ্মীবাই', 'হায়েনা', এই রকম। আমি এই সংঘের কাজে বীরেনের সহকারী এবং তাঁর বিলাত থাকা কালে এর সম্পাদক ছিলাম। তাই এই সব কথা বলছি।

"এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ

করবো। সেই বিষয় থেকে পুলিস কর্তৃপক্ষের যদি এই কেসের অনুসন্ধানের কাজে কিছু আলোকপাত হয়, সেই উদ্দেশ্যেই বলছি।

"গত মাসে বীরেন রায় ইংলণ্ড থেকে ফিরে আসার এক সপ্তাহ পরে আমরা অর্থাৎ শক্তি-সংঘের ছেলেমেয়েরা ও বীরেন রায়ের আত্মীয়-বন্ধুরা সকলে মিলে এই রায়ভিলায় একটি 'আনন্দ-মিলন' উৎসব করি। সারাদিন গান-বাজনা খাওয়া-দাওয়ার পর সন্ধ্যার সময় আমি রায়ভিলা থেকে বের হয়ে বড় রাস্তায় মোটরে উঠতে যাচ্ছি, ঠিক সেই সময় এক ভদ্রলোক এসে আমাকে বললেন, 'আপনার সঙ্গে একটি কথা আছে।' ভদ্রলোকটিকে আমার অচেনা মনে হলো, আমি বললাম, 'আপনাকে তো চিনতে পারছি নে। কি দরকার সংক্ষেপে বলুন। আমাকে এক্ষনি বাড়ি ফিরতে হবে।' ভদ্রলোক বললেন, 'বেশ তো, আপনার সঙ্গে গাড়িতে যেতে যেতে সব বলছি।' তিনি গাড়িতে উঠে আমাব পাশে বসলেন। আমি গাড়ি চালাতে আরম্ভ করলাম। ভদ্রলোকটির বয়স চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ, গায়ের রং বেশ ফরসা, মাথায় বড় বড় চুল, মুখে গোঁফদাড়ি। ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিলেন, তিনি এক বড় জমিদারের ম্যানেজার, তাঁর মনিবের বাগবাজারে যদিও মস্ত বাড়ি আছে, তবুও তিনি সানি-পার্ক বা রেনি-পার্ক কি ম্যাণ্ডেভিলার কাছে একটা বাড়ি করতে চান। সানি-পার্কে বীরেন রায়ের যে জমিটা পড়ে আছে, তা যদি ঐ জমিদারকে তিনি বিক্রি করেন, তাহলে জমিদারবাবু বাজার-দর অপেক্ষা বেশী দাম দিয়ে কিনতে পারেন। আমি বললাম 'কিন্তু বীরেন রায়ের জমি কেনা-বেচার বিষয়ে আমাকে কেন বলছেন? সোজা তাঁকে বললেই হয়?' ভদ্রলোকটি উত্তর দিলেন, 'তাতে একটা বাধা আছে। আমার মনিবের সঙ্গে বীরেন বাবুদের নিকট আত্মীয়তা আছে, তাই তিনি আপনার মাধ্যমে কথা কইতে চান। তাছাড়া আপনি একজন এটর্নি।' আমি তাঁর কথায় বাধা দিয়ে বললাম, 'আমি একজন এটর্নি সত্যি এবং আমার অফিসে এজাতীয় কাজও হয় সন্দেহ নেই। কিন্তু বীরেন

রায়ের কাছে আমি এটর্নি নই—বন্ধু। তবে আপনি যখন অনুরোধ করছেন, তখন এ বিষয়ে তাঁকে বলে দেখবো। আপনি আমার অফিসে সামনের সোমবার দেখা করবেন।' ভদ্রলোককে আমার একটি ভিজিটিং কার্ড দিলাম। গাড়ি শ্যামবাজারে এসে গেল, কিন্তু ভদ্রলোকের নামার লক্ষণ দেখা গেল না। ভদ্রতার খাতিরে তাঁকে নামার কথা বলতেও পারলাম না। তিনি আমার বরানগরের বাড়িতে গিয়ে কিছুক্ষণ থেকে চলে গেলেন। তাবপর তিনি কিন্তু আমাব বা বীরেনের সঙ্গে দেখা করেন নি। আমার বলবার আগে ভানু বা অন্য সকলে বীরেন রায়ের অপহরণকারীর চেহারার যা বর্ণনা দিলে, আমার সঙ্গে আলাপকারী সেই ভদ্রলোকটির চেহারার সঙ্গে তার সম্পূর্ণ মিল আছে,—পার্থক্য শুধু পোশাক-পরিচ্ছদে। ভদ্রলোকটির পরনে খদ্দরের স্যুট ছিল। বয়সের কথা আগেই বলেছি। আর তিনি যে জাতে বাঙালী, তা নিঃসন্দেহে বলতে পারি।"

অমিতাভ সেনের বক্তব্য শেষ হলো।

একজন পুলিস অফিসার বীরেন রায়ের মামা মিস্টার ওয়াই. মিত্রকে বললেন, "মিস্টার মিত্র, এ বিষয়ে আপনি যদি কিছু জানেন তো বলুন।"

মিস্টার মিত্র তন্ময় হয়ে একটা বিরাট বই পড়ছিলেন। হঠাৎ যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, "কি বিষয়ে?"

বালিগঞ্জ থানার ইন্‌স্‌পেক্টর বললেন, "আপনার ভাগ্নে বীরেন রায়ের অপহরণের বিষয় জিজ্ঞেস করা হচ্ছে।"

মিস্টার মিত্র বললেন, "ওঃ—হ্যাঁ! আমি জানি বই কি! সবই জানি। কিন্তু বড্ড ভুল হয়ে গেছে। তখন যদি বুঝতে পারতুম, তাহলে বীরেনকে সেই সাধুর সঙ্গে কক্ষনো যেতে দিতুম না। সাধু যখন বীরেনের ঘরে ঢুকলো, আমি তখন এই সামনের বারান্দায় ছিলাম। আমার পাশ দিয়েই তো লোকটি গেল—বেশ সুন্দর চেহারা, গেরুয়া ধুতি-পিরান পরা, চোখে নীল চশমা, মাথায় লম্বা লম্বা চুল, মুখে দাড়িগোঁফ। দেখে ভালো বলেই মনে হলো;—ইণ্ডিয়ান যোগীদের

আমি খুব শ্রদ্ধা করি। তখন কি জানতাম, সে একটা ইম্পস্ট্যার—ছদ্মবেশী। তাহলে তাকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলতুম।”

পুলিস সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, “আচ্ছা মিস্টার মিত্র, আপনি সেই সাধুকে তো খুব কাছ থেকেই দেখেছেন, তাকে কোন্ জাতির লোক বলে মনে হয়?”

মিস্টার মিত্র একটু চিন্তা করে বললেন, “কোন্ জাতির অর্থাৎ কোন্ রেসের? মানব জাতিকে মোটামুটি চারটি রেসে ভাগ করা হয়। প্রথম ধরুন, নিগ্রো বা ব্ল্যাক ডিভিশন; দ্বিতীয়ঃ এম্যারল্ড বা রেড ডিভিশন; তৃতীয়ঃ মঙ্গোলিয় বা ইয়োলো ডিভিশন—।”

পুলিস অফিসারদের প্রায় সকলেরই ধৈর্যচ্যুতি হবার উপক্রম হচ্ছিল, অবশ্য রায় সাহেবের ছাড়া। তিনি মিস্টার মিত্রের সব কথা মন দিয়ে শুনছিলেন। একজন অফিসার তাঁর কানে কানে কি বলতে তিনি মিস্টার মিত্রকে বাধা দিয়ে বললেন, “মিস্টার মিত্রের সঙ্গে এ বিষয়ে অন্য একদিন বিশেষভাবে আলোচনা করবো, আজ আমাদের সময় খুবই কম। সংক্ষেপে আপনার বক্তব্য বলুন—সাধুটির চেহারার বিষয় যা বলছিলেন বলুন, আমবা নোট করে নিই।”

বক্তৃতায় বাধা পাওয়ায় মিস্টার মিত্র বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হলেন বলে মনে হলো না, তিনি রায় সাহেবের দিকে চেয়ে বললেন, “লোকটির চেহারা? হুঁ! চেহারার বিষয় তো বলেছি বেশ ভালোই—সুপুরুষ, ফেয়ার কমপ্লেক্‌শন, টল ফিগার, সার্প-কাট নোজ, লং-ড্রন আইজ, কার্লিং ব্ল্যাক হেয়ার, নাইস বিয়ার্ড এণ্ড ম্যাসটাশ্। ঐ সাধুটির চেহারার সঙ্গে বীবেনের চেহারার খুব এফিনিটি বা সাদৃশ্য আছে।”

মিস্টার মিত্রের এ কথায় ঘরের সকলে হেসে উঠলো। তিনি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আবার বলতে লাগলেন, “এই রকম কিড্-ন্যাপিং কেস আমেরিকায় বেশী হয়, ইউরোপের অন্যত্রও কিছু কিছু হয়। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের পুলিসেরা এই রকম কেসে কোন্ কোন্ উপায় অবলম্বন করে, সে বিষয়ে এই বইখানায় কয়েকটা ইলাস্‌ট্রেশন আছে।

বইটা কাল পাবার পর থেকে পড়া আরম্ভ করেছি, এর দু-একটা স্থান আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি।"

পুলিস অফিসারেরা এবার আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। অসহায়ের মতো বারবার সবাই ঘড়ির দিকে তাকাতে থাকেন।

রায় সাহেব বললেন, "মিস্টার মিত্রের সঙ্গে দ্বিতীয় যেদিন দেখা হবে, সেই দিন বইটার বিষয় সব শুনবো। আজ আমরা সবাই খুব ব্যস্ত, এখন সকলেই উঠবো।"

মিস্টার মিত্র পাইপে তামাক ভরতে লাগলেন। পুলিসের দল শশব্যস্তে জীপ গাড়ি করে চলে গেল।

তখন বেলা প্রায় এগারোটা।

... ...

বুলেট ও বজ্র বীরেন রায়ের বৈঠকখানা থেকে বের হয়ে বাগানের মধ্যে আসতেই বোমা এসে জিজ্ঞাসা করলে, "কি বুঝলে ?"

বুলেট উত্তর দিলে, "তখন যা বলেছিলাম, এখনও আমার সেই ধারণা। সে সব কথা পরে হবে। এখনও আমাদের একটা কাজ বাকি আছে, সেটা সেরে বাড়ি ফিরবো।"

বজ্র জিজ্ঞাসা করলে, "কাজ ? এখনো ? কোথায় ?"

বুলেট উত্তর দিলে, "কাজ এই বাড়িতেই, অর্থাৎ এই বাড়িটা ভালো করে দেখবো।"

বোমা মোটরে গিয়ে বসলো।

বুলেট বজ্রকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির বাইরেটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো।

বিরাট বাড়ি, সাবেকী অর্থাৎ গত শতাব্দীর প্রথায় তৈরী। বাড়ির সামনে ফুলবাগান, ছোট লন, জলের ফোয়ারা, স্ট্যাচু ; গেটের ধারে চাকর-দরোয়ানদের ঘর।

গেটের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বুলেট বললে, "এ গেটটা তৈরী হয়েছে পরে, তা বেশ বোঝা যায়।"

বজ্রও বললে, "হুঁ, গেটটা আধুনিক প্রথায় তৈরীই বটে। মনে হয়, পুরোনো গেট ভেঙে এটা তৈরী হয়েছে।"

ভানু এদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল, সে বুলেটদের বললে, "এ বাড়ির আর একটা গেট আছে, সেটা ব্যবহার করা হয় না—পুরনো।"

ভানু বুলেটদের সেই গেটটা দূর থেকে দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল।

বুলেট পুরনো গেটটা ভালো করে দেখতে দেখতে এগিয়ে গিয়ে বজ্রকে বললে, "দ্যাখ দ্যাখ. গেটটায় লেখা রয়েছে 'দশক্ষরা হাউস'।"

বজ্র বললে, "কি বিচিত্র নাম!"

একটু চিন্তা করে ধীরে ধীরে বুলেট বললে, "আমার কি মনে হয়, জানো? বীরেনদাদের আদি দেশ ছিল এই দশক্ষরায়। এঁদের পূর্ব-পুরুষ যিনি এই বাড়ি তৈরি করেছিলেন, তিনিই এই নাম দিয়েছিলেন হয়তো।"

বজ্র বললে, "হুঁ, তা বটে! কলকাতায় এ রকম নামের বাড়ি অনেক আছে—যেমন 'টাকী হাউস', 'জনাই কটেজ'।"

বুলেট কি ভাবছিল, বজ্রকে বললে, "এখন আবিষ্কার করতে হবে, 'দশক্ষরা' জায়গাটা কোথায়। বীরেনদার কোন জ্ঞাতি বা শরিক সেখানে আছে কিনা। দশক্ষরার সন্ধান আমি নেব, এখন চল যাই। তুমি আর বোমা বীরেনদার চাকর ভানুকে নিয়ে সন্ধ্যাব সময় আমাদের বাড়িতে যাবে, আমি বাড়িতে থাকবো। এইবার আমাদের অনুসন্ধানের কাজ আরম্ভ হবে।"

বুলেট ও বজ্র রায়ভিলা থেকে বের হলো। মিস্টার মিত্র তখন ওপরের বারান্দায় কৌচে বসে ম্যাণ্ডোলিন বাজাচ্ছেন।

... ...

ভবানীপুরে ল্যান্সডাউন রোড থেকে বেরিয়ে গেছে একটা চওড়া রাস্তা। এই রাস্তার প্রথম বাড়িটা বুলেটদের—বাড়িটা দোতলা, বেশী বড় নয়, সামনে একটা ছোট মাঠ ও গেট আছে।

বুলেট সারাদিন তার পড়ার ঘরে বসে ডাকঘরের তালিকা,

রেলওয়ে টাইমটেবল, বাংলার ম্যাপ, পাঁজি, ভূগোল ইত্যাদি তন্নতন্ন করে খুঁজেছে ; কিন্তু 'দশঙ্করা' জায়গাটা কোথায়, বের করতে পারে নি।

সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় বোমার মোটর তাদের বাড়ির মাঠে এসে থামলো। বজ্র, বোমা ও ভানু এসে গেল। বুলেট এদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। ঘর থেকে বের হয়ে এলো।

মাঠে ঘাসের ওপর এসে বসলো তারা। ভানু দাঁড়িয়ে ছিল, বুলেট তাকে বসতে বলে বললে, "আজ তোমার সঙ্গে, ভাই, আমাদের খুব দরকারী কথা আছে।"

একটু দূরে ভানু বসলো। বজ্র বুলেটকে জিজ্ঞাসা করলে, "দশঙ্করার সন্ধান পেলে ?"

বুলেট কি বলতে যাচ্ছিল, ভানু বলে উঠলো, "দাদাবাবুরা দশঙ্করার নাম জানলেন কি করে ? সেখানে তো বাবুদের আদি দেশ—"

ভানুর কথায় বুলেট প্রায় লাফিয়ে উঠলে, "এ্যাঁ ! বল কি ভানু ? তোমার বাবুদের আদি দেশের কথা তুমি জানো ? বল তো কোথায় ? ওঃ ! এটা জানবার জন্যে আজ সারাদিন কি পরিশ্রমই না করেছি !"

তার বাবুদের আদি দেশের কথা জানার এতটা আগ্রহ কারো হতে পারে, তা ভানুর ধারণায় ছিল না। সে বললে, "তা ঠিক করে বলতে পারবো না—ভালো মনে নেই। যখন খুব ছোট ছিলুম, সেই সময় কর্তাবাবুর সঙ্গে টমটম গাড়ি করে মাত্র একবার দশঙ্করায় গিয়েছিলুম। বাবুদের সে কি বড় বাড়ি, বিরাট পুকুর, নবতখানা—"

তার কথায় বাধা দিয়ে বুলেট বললে, "সে সব কথা পরে শুনবো ; এখন বল দশঙ্করাটা কোথায় ? অন্তত কত দূরে ও কোন্ দিকে, তাও যদি বলতে পার, তাহলেও কাজ চলবে।"

ভানু খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললে, "বালিগঞ্জ থেকে টমটম করে আমরা খুব ভোর বেলা বের হয়ে দুপুর বেলায় সেখানে পৌঁছেছিলুম। মাঝে অবশ্য ওয়েলার দুটো কিছুক্ষণ দানাপানি খাওয়ার জন্যে জিরিয়ে নিয়েছিল। তাহলে বুঝুন, জায়গাটা কতদূর। বাবুদের গ্রাম থেকে

খানিকটা দূরে মস্ত বড় নদী আছে, সেখানে কেল্লা আছে, কেল্লায় গোরা সৈন্য থাকে···সে জায়গাটার নাম কি হাওড়া যেন।"

বুলেট ভানুর সব কথা খুব মন দিয়ে শুনছিল, বললে, "হাওড়া? হাওড়া কি !·· ধ্যেৎ! স—ব গুলিয়ে দিলে!"

ভানু অপ্রস্তুত হয়ে বললে, "না, হাওড়া ঠিক নয়, হাওড়া কথাটার আগে কি যেন আর একটা কথা আছে···ডাই—ডাইমণ্ড হাওড়া।"

বজ্র বললে, "ডাইমণ্ড হাওড়া আবার কি?"

বুলেট লাফিয়ে উঠে বললে, "হয়েছে! হয়েছে! ইউরেকা! ডায়মণ্ড হাববার। ওঃ! এতক্ষণ বাদে দশক্ষরার সন্ধান কিছুটা পাওয়া গেল।"

সকলে হেসে উঠলো। ভানুও হাসলো। কিন্তু এই সামান্য ব্যাপাবে এতটা হাসির কি কারণ থাকতে পারে, সে বুঝতে পারলে না।

বুলেট বললে, "আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, ডায়মণ্ড হারবারের দিকে গেলে দশক্ষরার সন্ধান মিলবে। এখন সে কথা থাক। তোমাদের এই সময় যে জন্যে আসতে বলেছিলুম, সেই কথা বলি।"

ভানু এতক্ষণ একটু দূরে বসে ছিল, বুলেট তাকে কাছে বসিয়ে ধীরভাবে বললে, "ভানু, তুমি নিশ্চয়ই তোমাব বীরেনদাদাবাবুকে খুব ভালোবাস, আমবাও সকলে তাঁকে খুব ভালোবাসি, ভক্তিও করি। বীরেনদাকে বদমাশ লোকে চুরি করে নিয়ে গেছে, আমরা তাঁকে উদ্ধার করবার চেষ্টায় নামছি। তোমাকেও সেজন্যে দরকার। তোমার কাছ থেকে কতকগুলো খবর জানতে চাই। দরকার হলে এ ব্যাপারে তোমাকে দিয়েও কিছু কিছু কাজ করাতে চাই;—বলো রাজী তো?"

ভানু উত্তর দিলে, "সে কথা কি আর পুছতে হয়! দাদাবাবুর ভালোর জন্যে আমাকে আপনারা যা বলবেন, তাই করবো।"

বুলেট বললে, "কিন্তু খুব সাবধান! আমরা যে এই চেষ্টা করছি, তা কাউকে বলবে না, এমন কি পুলিসকেও নয়।"

ভানু বললে, "তা যখন মানা করে দিচ্ছেন, তখন বলবো না।"

বুলেট বললে, "বেশ। আচ্ছা, ভানু, সেদিন রাত নটা নাগাত যখন সেই সাধু বীরেনদাকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়, তুমি তো ওদের সঙ্গে জগুবাবুর বাজার পর্যন্ত গিয়েছিলে। তারপর তুমি ও বীরেনদা সাধুর গাড়ি থেকে নেমে নার্সের বাড়ির দিকে কিছু দূর যাবার পর বৃষ্টি আসতে, তুমি তোমার দাদাবাবুর ওয়াটার প্রুফ্‌টা আনতে সেই সাধুর মোটর যেখানে ছিল, সেখানে গিয়েছিলে। সেই সময় তুমি দেখলে, সাধুর মোটর একটা গলির মধ্যে একটা মোটর গাড়ি সারানোর কারখানাব সামনে রয়েছে, আর সাধু একজন হিন্দুস্থানীর সঙ্গে কথা বলছে, আর তোমাদের বয়সী একটা ছেলে পেট্রলের টিন এনে সাধুর মোটরে রাখছে—এসব তো তুমি ভালো ভাবেই দেখেছ, কি বল?"

ভানু উত্তর দিলে, "হ্যাঁ, ভালো ভাবেই দেখেছি।"

বুলেট বললে, "সেই কারখানা আর ঐ লোক দুটোকে তুমি এখন দেখলে চিনতে পারবে?"

ভানু উত্তর দিলে, "হ্যাঁ! তবে সেই কারখানা বা যে ছেলেটা পেট্রলের টিন বইছিল, তাদের চিনতে পারবো; কিন্তু সেই হিন্দুস্থানীকে বোধহয় চিনতে পারবো না। তাকে ভালো করে দেখি নি।"

বজ্র বললে, "যাক্‌, তুমি যতটা পার, করবে।"

বুলেট সকলকে উদ্দেশ করে বললে, "সকলেই শুনে রাখ, আমার মনে হয়, বীরেনদাকে যারা অপহরণ করেছে, তারা খুব বুদ্ধিমান ও সাংঘাতিক প্রকৃতির লোক; তারা নিশ্চয়ই পুলিসের দিকে লক্ষ্য রাখছে। কিন্তু ওরা যদি জানতে পারে, আমরাও তাদের সন্ধান করছি, তাহলে শুধু যে আমাদের বিপদে পড়তে হবে তাই নয়, ওরা আরও সতর্ক হয়ে যাবে। তাই, আমার বক্তব্য, আমরা যা কিছু করবো, তা অতি গোপনেই আর খুব সাবধানেই করবো।"

বজ্র বললে, "নিশ্চয়ই। আমাদের 'শক্তি-সংঘে'র ছেলেমেয়েরা ছাড়া কাউকে আমাদের এই প্রচেষ্টার কথা জানতে দেব না—বাইরের

লোক এক এই ভানুই যা জানলে। তা ওকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যেতে পারে।”

বুলেট হাতঘড়ি দেখে বললে, “ঠিক সময় হয়েছে। এইবার সকলে অনুসন্ধানের কাজে বের হব। আজকের এই কাজে ভানুই আমাদের প্রধান সহায়। এখন আমরা যাব জগুবাবুর বাজারের দিকে। ওখানে গিয়ে কে কি করবো, তাব একটা প্ল্যানও এবার আমরা ঠিক করে নিই।

“আমরা সবাই বোমার মোটরে করে জগুবাবুব বাজারের দক্ষিণ-পশ্চিম গেটের সামনে গিয়ে থামবো। প্রথম আমি ও ভানু মোটর থেকে নেমে বাজারের মধ্য দিয়ে উত্তরে মোহিনীমোহন রোডে আসবো। বজ্র দূর থেকে আমাকে ফলো করবে। বজ্র মোটর থেকে নেমে গেলে বোমা তার মোটর নিয়ে নর্দার্ন পার্কের উত্তর গেটের সামনে অপেক্ষা করবে। আগেই বলেছি, আজকের কাজে ভানুর ওপরই সব নির্ভর করছে। ও যদি ঠিকমত সব করতে পারে, তাহলে মনে হয়, আজই আমরা কিছু ক্লু পাব।”

তারপর একটু থেমে সে আবাব বললে, “শোন ভানু, তুমি আর আমি জগুবাবুর বাজার থেকে বেরিয়ে সেই কারখানার দিকে যাব; ভাব দেখাব, যেন আমাদের একটা পোষা কুকুর হারিয়ে গেছে, আর আমরা সেই কুকুরটাকে ঐ দিককার রাস্তায় রাস্তায় খুঁজে বেড়াচ্ছি। তুমি একটু এগিয়ে চারদিক চাইতে চাইতে যাবে, আমি তোমার পিছনে থাকব। সেই কারখানাব সামনে গিয়ে তুমি বলবে, ‘বাবু, এইখানে কুকুরটাকে দেখেছিলুম।’ কিন্তু সেখানে মোটেই দাঁড়াবে না। যদি সেই ছেলেটাকে দেখতে পাও তো ইশারা করে তাকে দেখিয়ে দিয়ে বলবে, ‘আমার ভাই এই পাড়ায় থাকে, সে যদি কুকুরটার সন্ধান দিতে পারে’,—এর বেশী কিছু বলবে না। আর যদি সেই হিন্দুস্থানীটাকে দেখে চিনতে পার, তাহলে তার দিকে চেয়ে নাক চুলকোবে। এই লোকটার বেলায় খুব সাবধান হবে। তাকে

ইশারা করেও দেখাবে না। আর, কোন কারণেই বেশী কথা বলবে না।"

... ...

সন্ধ্যা ছটা। জগুবাবুর বাজার জমজম করছে। দক্ষিণ দিকের গেটের প্রায় সামনে জনকতক পানওয়ালা ফুটপাতের ওপর বসে তার-স্বরে চিৎকার করছে। বোমা ঠিক তাদের পিছনে পদ্মপুকুর রোডের উপর গাড়ি থামাতেই, বুলেট ও ভানু মোটর থেকে নেমে বাজারের মধ্যে ঢুকলো। কিছু পরে বজ্র তাদের অনুসরণ করলে। বোমা মোটর নিয়ে চলে গেল।

বাজারে ঢুকে বুলেট একটা কুকুরের চেন কিনে উত্তর দিকের গেট দিয়ে মোহিনীমোহন রোড ধরে পুব দিকে চলতে লাগলো। ভানু তার সঙ্গে যাচ্ছে দু-এক পা আগে আগে। কিছুদূর যাবার পর বুলেট বললে, "কুকুরটা যে কোথায় গেল—অমন পোষা কুকুর!"

দ্বারকানাথ রোড পার হয়ে একটু আসতেই ভানু হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লে। বললে, "বাবু, এইখানে তখন কুকুরটাকে দেখেছিলুম।"

বুলেট দেখলে ভানুর ঠিক সামনে একটা মোটর গাড়ি সারাবার কারখানা—কারখানার একটা জায়গায় টিনের সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে 'আগলু মাহাতো এণ্ড কোম্পানী'। কারখানার মধ্যে একটা লেদ চলছে, চার-পাঁচ জন মিস্ত্রী কাজ করছে তখনও।

ভানু বললে, "বাবু, আস্থন এই দোকানের পিছনদিকের গলিটা একবার দেখে আসি, যদি কুকুরটা ওখানে থাকে।"

গলিটা একটু অন্ধকার। একখানা বাড়ি পার হতেই ভানু আবার বললে, "আমার ভাই এ পাড়ায় থাকে, সে যদি কুকুরটা দেখে থাকে শুধবো—।" ভানু ইশারা করে একটা ছেলেকে দেখালে।

ছেলেটার বয়স আঠারো-উনিশ, গায়ের রং কালো, পরনে খাকী হাফপ্যান্ট ও স্যাণ্ডো গেঞ্জী, দুই-ই খুব ময়লা—কালিঝুলি মাখানো। তাকে দেখলেই কারখানার মিস্ত্রী বলে মনে হয়। ছেলেটা একটা

মোটর গাড়ির মাডগার্ড নিয়ে 'আগলু মাহাতো এণ্ড কোম্পানী'র কার-খানায় ঢুকলো। বুলেট বেশ ভালোভাবে তাকে দেখে নিয়ে ভানুকে বললে, "চল্ কুকুরটার জন্যে আজ আর সময় নষ্ট করতে পারি নে, ঢের খোঁজাখুজি করেছি। কাল সকালে দেখা যাবে।"

তারা গলি ধরে নর্দার্ন পার্কের উত্তর দিকের গেটের সামনে এসে গেল। বোমা মোটরে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। বজ্র বুলেটদের এতক্ষণ অনুসরণ করছিল, সে একটু পরে আসতেই বুলেট তাকে বললে, "তোমরা এখন ফিরে যাও, আমি এখনি আবার ঐ দিকে যাবো। আজকের যাত্রা বেশ সফল বলে মনে হয়। বজ্র, তুমি সকাল ছটায় সাইকেল নিয়ে আমার বাড়িতে আসবে, রেডি হয়ে এসো। আমরা দুজনে ডায়মণ্ড হাববার দেখতে যাব।"

বজ্র, ভানু ও বোমা মোটর নিয়ে চলে গেল।

বুলেট আবার মোহিনীমোহন রোডে 'আগলু মাহাতো এণ্ড কোম্পানী'র কারখানার সামনে একটা চায়ের দোকানে গিয়ে উঠলো। এক কাপ চা নিয়ে কারখানার দিকে লক্ষ্য রেখে চা খেতে শুরু করলে।

কারখানাটা বেশী বড় নয়। জনপাঁচেক লোক সেখানে কাজ করে। একটা মোটা মত হিন্দুস্থানী তক্তপোশের ওপর একটা ক্যাশ বাক্স নিয়ে বসে আছে। মনে হয়, সে-ই দোকানের মালিক।

রাত সাতটা বাজতেই কারখানা বন্ধ হয়ে গেল। ভানু একটু আগে যে ছেলেটিকে দেখিয়ে দিয়েছিল, সে কারখানার সব ঝাঁপ বন্ধ করলে। একটা দরজা শুধু খোলা রইল। কারখানার লোকেরা সেই দরজা দিয়ে বের হয়ে যে যার দিকে চলে গেল। সেই ছেলেটা বেরোলো একটু পরে। দ্বারকানাথ রোড ধরে কিছু দূর গিয়ে সে একটা চায়ের দোকানে ঢুকে টিনের চেয়ার টেনে নিলে। চা ও লেড়ো বিস্কুটের অর্ডার সে দিয়েছিল ঢোকবার সময়েই। প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গে বুলেটও দোকানে ঢুকে ছেলেটার পাশের চেয়ারে বসে দুটো কেকের

অর্ডার দিলে। ছেলেটার সঙ্গে তার চোখাচোখি হলো দু-চারবার। মৃদু হেসে বুলেট শেষে বললে, "তোমাকে, ভাই, যেন চিনি চিনি মনে হচ্ছে,—কোথায় থাক তুমি ?—এই পাড়ায় ?"

ছেলেটা বুলেটের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলে, "আমি থাকি হাজরা রোডে লকার বস্তীতে, তবে এ পাড়ায় কাজ করি আগলু মাহাতো এণ্ড কোম্পানীর কারখানায়।"

বুলেট বললে, "ওঃ! তাই তোমাকে দেখেছি। আমাদের মোটর গাড়ির মাডগার্ড আগলু মাহাতো এণ্ড কোম্পানী থেকে সারিয়েছিলুম। তুমি কি ঐ কারখানার মিস্ত্রী ?"

ছেলেটা উত্তর দিলে, "না। এখনও মিস্ত্রী হতে পারি নি; তবে হাফ-মিস্ত্রী বলতে পারেন। মাডগার্ডের কাজ থেকে লেদের কাজ অবধি সবই জানি।"

বুলেট বললে, "লেদের কাজ জানো? আমার জানা একটা কারখানায় লেদের জন্যে জনকতক লোক খুঁজছে। তুমি সেখানে কাজ করতে চাও তো ব্যবস্থা করে দিতে পারি—ভালো মাইনে পাবে।"

আশান্বিত হয়ে ছেলেটা বললে, "নিশ্চয়ই করবো। এখানে খুব কম হপ্তা পাই, তাতে চলে না।"

বুলেট বললে, "বেশ। ভালোই হলো। চলো, তোমার সঙ্গে একটু নিরিবিলি কথা বলি। তোমার নাম কি ?"

"পোনা দাস।"

একটা রিক্সা করে বুলেট পোনা দাসকে নিয়ে নর্দার্ন পার্কে এসে মাঠের ঠিক মাঝখানে গিয়ে বসলো। সেখানে ভীড় খুব কম।

চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বুলেট চাপা গলায় পোনাকে বললে, "শোন ভাই, চায়ের দোকানে তখন কাজের সম্পর্কে তোমাকে যা বলেছিলুম, তা ঠিকই আছে। বড় একটা কারখানায় তোমাকে ঢুকিয়ে দিতে পারি এবং দেবও। কিন্তু এখন ঠিক সেজন্যে তোমাকে এখানে আনি নি। যেজন্যে আনলুম, তা বলি—আমার একটা কাজ

তোমাকে করে দিতে হবে। কাজটা একটু হুঁশিয়ারির! এই নাও অগ্রিম পাঁচ টাকা, কাজ করবার সময় আরও পাবে।"

বুলেট পোনাকে একখানা পাঁচ টাকার নোট দিলে। নোটটা পেয়ে পোনা যেন গলে গেল, একগাল হেসে জিজ্ঞাসা করলে, "মোটরের কোন পার্ট্‌স্ চাই বুঝি?"

বুলেট উত্তর দিলে, "না, ঠিক তা নয়। তুমি তো আগলু মাহাতো এণ্ড কোম্পানীতে কাজ করো, আমি ঐখানকার কয়েকটা খবর জানতে চাই। খবর কয়টি ঠিক ঠিক পেলে আমার একটু সুবিধা হয়। আর তার জন্যে হাতে হাতে তুমি টাকাও পাবে।"

পোনা বললে, "কি খবর জানতে চান?"

বুলেট জিজ্ঞাসা করলে, "তোমাদের কারখানার মালিক কে? সে-লোকটা কেমন?"

পোনা উত্তর দিলে, "কারখানার মালিক দুজন বেহারী—একজনের নাম আগলু মিশির, অন্যজনের নাম বংশী মাহাতো। লোক ওরা মোটেই ভালো নয়। একটা কারখানা দেখিয়ে রেখেছে শুধু, ওদের আসল কারবার হলো চোরাই জিনিসের কেনা-বেচা।"

বুলেট বললে, "তা মোটামুটি আন্দাজ করেছিলুম। আচ্ছা, বলতে পার, মাঝে একদিন রাত সাড়ে আটটা নাগাত একটা সাধু গোছের লোক ওদের কাছে এসেছিল কি না?"

মুখ বেঁকিয়ে পোনা উত্তর দিলে, "হুঁ, খুব পারি। লোকটা সাধু না ছাই—একটা আস্ত জুয়োচোর, ওদের চোরাই কারবারের একজন পাণ্ডা। সে মাঝে মাঝে কারখানায় আসে। আরো অনেকে আসে। কি সব সলা পরামর্শ হয়; আমাদের জানায় না। ওসব ব্যাপারে আমরা নেই। তা না হলে এই দশা!"

বিষণ্ণ চোখে পোনা তার ছেঁড়া ময়লা কাপড়চোপড়ের দিকে ইঙ্গিত করলো।

চাপা গলায় বুলেট বললে, "ভাই পোনা, তোমাকে একটা কাজ

করতে হবে, অবশ্য শুধু একটা খবর দেওয়া—অন্য কিছু নয়। আর এজন্যে তুমি টাকাও পাবে।"

পোনা বললে, "কি খবর জানতে চান ?"

বুলেট বললে, "সাধু লোকটার খবর চাই। লোকটা কোন্ ধাঁচের ঠিক বুঝতে পারছি নে। তুমি বলছো, মোটেই ভালো নয়। আমারও তাই মনে হচ্ছে। ওর কথায় বিশ্বাস করে আমরা একটু ফ্যাসাদে পড়েছি। ও যখনি কারখানায় আসবে, তক্ষনি আমাকে তোমার খবর দিতে হবে। পারবে ? তুমি ফোন করতে জানো ?"

"জানি। আমাদের কারখানায় ফোন— ।"

বাধা দিয়ে বুলেট বললে, "না। সে ফোনে খবর দেবে না। অন্য কোন জায়গা থেকে আমাকে খবর দেবে। সব কথা ফোনে বলবে না, আমাকে শুধু ডাকলেই বুঝতে পারবো।"

বুলেট নিজের ফোন নম্বর দিয়ে বললে "কিন্তু খুব সাবধান, বুঝলে ?"

বুলেট ও পোনা নর্দার্ন পার্ক থেকে যখন বের হলো, রাত তখন প্রায় সাড়ে আটটা।

।। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।।

প্রায় সাড়ে তিন শো বছর আগের কথা।

এক মহা দুর্যোগের রাত—বোধহয় দুইপ্রহর। দারুণ শীত পড়েছে। সারা আকাশ ঝুলের মতো কালো কালো মেঘে ও জমাট কুয়াশায় ঢাকা। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে হু হু করে। চারদিকে ভয়াবহ নিঝুম স্তব্ধতা। জনপ্রাণীর সাড়া নেই কোথাও।

প্রকৃতি যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ধূমঘাটা আজ কদিন নীরব নির্জন। যশোর রাজ্যের প্রজারা বেশীর ভাগ মোগল সৈন্যদের হাতে নিহত হয়েছে, অন্যেরা কোনমতে প্রাণ নিয়ে রাজধানী ত্যাগ করে দূরে পালিয়েছে। প্রতাপাদিত্যের প্রাসাদ আজ খাঁ খাঁ করছে—যেন মহা শ্মশান। একটি জীবও সেখানে নেই।

সেই দারুণ রাতে রাজপ্রাসাদের পিছনের পরিখার ওপর ঘন অন্ধকারের মধ্যে একজন লোক অধীর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। লোকটি প্রৌঢ়। ভালো করে দেখলে তাঁকে বলশালী ও অভিজাত বংশীয় বলে মনে হয়। প্রৌঢ়টির দেহ স্থানে স্থানে ক্ষতবিক্ষত।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি আশে পাশে ও সামনে যমুনা নদীর দিকে লক্ষ্য করছেন ; এক-একবাব অন্ধকার আকাশের দিকে তাকাচ্ছেন। প্রৌঢ়টির পায়ের কাছে একটা মাঝারি আকারের লোহার সিন্দুক আর একটা গাদা বন্দুক। কি এক অজ্ঞাত কারণে অধীর উৎকণ্ঠায় তিনি অপেক্ষা করছেন।

বহুক্ষণ পরে গভীর অন্ধকারের মধ্যে অল্প দূরে একটি লোককে দেখা গেল—গাছপালার মাঝ দিয়ে সে প্রৌঢ়টির দিকেই এগিয়ে আসছে। প্রৌঢ় তাড়াতাড়ি বন্দুকটা হাতে নিয়ে দৃঢ় চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, "কে ?"

আগন্তুক উত্তর দিলে, "বাবা, আমি—তুর্লভ।"

তুর্লভ কাছে এলো। প্রৌঢ় জিজ্ঞাসা করলেন, "বাড়ির সকলকে বসুরহাটে রেখে এসেছো তো ?"

তুর্লভ বললে, "হাঁ। সেইজন্যেই দেরি হয়ে গেল। ওদিক থেকে ফেরবার সময় নৌকো পাই নি। এখানে এসে মা যশোরেশ্বরীর কৃপায় একটা কোশা নৌকো পেয়েছি। নৌকো চালাবার লোকও পেয়েছি। মহাবাজার একদল নৌসেনা ও মাঝিমাল্লা রাতের অন্ধকারে দেশে ফিরছিল, আপনার কথা বলতেই তারা রাজী হয়ে গেল। তারা আমাদের সাগরদ্বীপে পৌঁছে দেবে। ওদের বাড়িও ঐদিকে।"

নদীর দিকে ফিরে তুর্লভ একটা সাংকেতিক শব্দ করতে জনকয়েক নৌসেনা এসে প্রৌঢ়কে মহাসম্ভ্রমের সঙ্গে কুর্নিশ করলে। ওদের দলপতি বললে, "মীরবহর সাহেব, আপনার হুকুম চিরদিন তামিল করে এসেছি, এই শেষবারও করবো। আমরা হতাশ হয়ে যে যার ঘরে ফিরছিলুম, আপনাকে পেয়ে ভালোই হলো। আপনার সঙ্গে আমরাও সাগরদ্বীপে যাব, সেখানে আপনার অধীনে আবার কাজ করবো। মনে হয়, সাগরদ্বীপ এখনও মোগলদের হাতে যায় নি বা ধুমঘাটার খবর ওখানে পৌঁছয় নি।

অন্ধকার আকাশের গায়ে দু-একটা তারা ফুটেছে। সেদিকে লক্ষ্য করে প্রৌঢ় মীরবহর বা নৌসেনাধ্যক্ষ মধুসূদন রায় বললেন, "ঠিক রাত দ্বিপ্রহর। আব আমাদের দেরি করা সঙ্গত হবে না। এক্ষনি যাত্রা করতে হবে।"

দুর্লভ বললে, "বাবা, আপনি ঘাটে গিয়ে নৌকোতে অপেক্ষা করুন। আমরা সিন্দুকটা নিয়ে সেখানে যাচ্ছি।"

মধুসূদন রায় বললেন, "না, আমিও সিন্দুকের সঙ্গে সঙ্গে যাব। মহারাজার শেষ আদেশের কণামাত্র অবহেলাও আমার দ্বারা হবে না।"

নৌসেনারা সিন্দুকটা নিয়ে নদীর দিকে রওনা হলো। মধুসূদন রায় বন্দুক-হাতে ওদের সঙ্গে চললেন।

দুর্লভ জিজ্ঞাসা করলে, "বাবা, আপনার হাতে কি ওটা বন্দুক ?"

মধুসূদন রায় জবাব দিলেন, "হাঁ। একটা বন্দুক আর কিছু ছটরা বারুদ সঙ্গে নিয়েছি।"

দুর্লভ বললে, "আর বন্দুক বারুদ! ও সবের দরকার তো ফুরিয়ে গেলো!"

মধুসূদন রায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "হুঁ! তা বোধহয় গেলো। তবে যাচ্ছি বহু দূরদেশে,—পথে চোর-ডাকাত, মগ-ফিরিঙ্গি জলদস্যুর দল, হিংস্র জন্তুজানোয়ার আরো কত কি থাকতে পারে। তাই এটা সঙ্গে নিয়েছি। মহারাজার এই সিন্দুকটা তাঁর দ্বিতীয় রাজধানী সাগরদ্বীপে পৌঁছে না দেওয়া পর্যন্ত আমাকে আত্মরক্ষা করতেই হবে।"

যমুনা নদীর রাজঘাট থেকে কিছু দূরে গোপন একটা ঝুপী জঙ্গলের মধ্যে নৌকোটা নোঙর করা ছিল। নদীতে তখনও ভাটার টান পড়ে নি। নৌকোটা একেবারে তীর ঘেঁষে আছে। নৌ-সেনাদের তাই সিন্দুকটা নৌকোয় তুলতে বেশী কষ্ট হলো না।

দুর্লভ বললে, "বাবা, এইবার আপনি উঠুন।"

মধুসূদন রায় তন্ময় হয়ে রাজপ্রাসাদের দিকে চেয়ে ছিলেন। দুর্লভের ডাকে যেন সম্বিৎ ফিরে এলো। কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোলো না। তাঁর দুচোখে তখন জলের ধারা নেমেছে।

নিঃশব্দে তিনি ধীরে ধীরে নৌকোয় উঠলেন। দুর্লভ উঠতেই নৌকো ছেড়ে দিলে।

বোধহয় অমাবস্যা বা প্রতিপদ তিথি। ফাঁকা চওড়া নদীর উপরেও গভীর অন্ধকার। নদীতে ভাটার টান পড়েছে। কিছুদূর আসতে মধুসূদন রায় নৌসেনাদের উদ্দেশ করে বললেন, "এইখানে বোধহয় মহারাজার ঘাট—নয় ?"

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বাঁধানো ঘাটের সামনে নৌকো এসে গিয়েছিল। ওদের একজন উত্তর দিলে, "হাঁ, হুজুর।"

মধুসূদন রায় ঘাটের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "মোগল সৈন্যরা সেদিন যখন রাজপ্রাসাদের অন্দরমহলে ঢুকলো, তখন মহারানী শরৎকুমারী রাজপরিবারের স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে গুপ্তদ্বার দিয়ে এই ঘাটে এসে আত্মবিসর্জন দিয়েছিলেন। দুর্লভ, আমরা রক্ষা করতে পারি নি—"

মধুসূদন রায়ের চোখ দিয়ে অবিরল জল গড়িয়ে পড়ে।

দুর্লভ সান্ত্বনার সুরে বললে, "সে কথা ভেবে আর কি ফল, বাবা। আপনি তো রাজপরিবারকে রক্ষা করার জন্যে প্রাণ বিসর্জন দিতে গিয়েছিলেন।"

মধুসূদন রায় ক্ষুব্ধ হতাশ কণ্ঠে বললেন, "কিন্তু ব্যর্থ হতে হলো।"

ভাটার টানে নৌকো ঠিকমতোই চলছিল। হঠাৎ একজন মাঝি চাপা গলায় বললে, "এই জায়গাটা খুব চুপি চুপি পার হতে হবে। এখানে বোধহয় মোগল সেপাইদের একটা ঘাঁটি আছে। আমরা

গুন টেনে যাবো। হুজুর ছইয়ের মধ্যে যান। যতক্ষণ না খাঁড়ি পার হচ্ছি, ততক্ষণ বিপদের সম্ভাবনা পুরোপুরি থাকবে।”

মাঝিদের আট-দশজন নিঃশব্দে নৌকো থেকে নেমে নদীর তীরে উঠে গুন টেনে চললো। দাঁড়ের শব্দ হলে বিপদের সম্ভাবনা আছে।

নৌকোর গলুয়ের উপর মধুসূদন রায় বসে ছিলেন। স্থির গম্ভীর। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ধূমঘাটাব দিকে নিষ্পলক চোখে চেয়ে আছেন। গভীব অন্ধকার,—তবুও অল্প অল্প দেখা যাচ্ছিল প্রতাপাদিত্যের প্রাসাদ, দুর্গ, প্রাকার, মন্দিরের চূড়া। মধুসূদন রায়ের দৃষ্টিপথ থেকে অল্প অল্প করে ধূমঘাটা মিলিয়ে গেল—বোধহয় চিরদিনের জন্যে। মধুসূদন রায় ছইয়ের মধ্যে গেলেন।

শীতের রাতের উত্তুরে বাতাস ও ভাটাব টানে মধুসূদন রায়ের নৌকো চলেছে হু হু করে; মাঝিরা পাল খাটিয়ে দিলে। তারা যশোরেব সীমানা পাব হয়েছে।

... ...

চূড়ান্ত দুঃখ-কষ্টের দিনও কেটে যায়। মধুসূদন রায় ও তাঁর সঙ্গীদেরও দু দিন দু রাত কেটে গেল। যমুনা নদী ছেড়ে নৌকো রায়মঙ্গলে পড়েছে। এ অঞ্চলে লোকের বাস খুব কম। নদীর দুপাশে মাঝে মাঝে হোগলা হেঁতালের জঙ্গল।

দুর্লভ ঘুম থেকে উঠে দেখলে—মধুসূদন রায় ইতিমধ্যে কখন উঠে চুপ করে বসে আছেন, কি চিন্তা করছেন গভীর তন্ময় হয়ে।

দুর্লভ বললে, “বাবা, আপনি ঘুমোন, এখনও সকাল হয় নি।”

হঠাৎ চিন্তাজাল ছিঁড়ে যেতে মধুসূদন রায় যেন একটু চমকে উঠলেন। কিছুক্ষণ দুর্লভের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, “আর শোব না। তুমিও আর শুয়ো না, আমার পাশে এসে বস। তোমাকে আমার অনেক কথা বলবার আছে।”

দুর্লভ এসে মধুসূদন রায়ের পাশে বসলো। ধরা গলায় ধীরে ধীরে মধুসূদন রায় বলতে লাগলেন, “লেখাপড়ার সুবিধা হবে বলে

ছেলেবেলা থেকেই তোমাকে তোমার মামার বাড়িতে রেখে দিয়েছিলাম। তুমি এদিককার খবর কিছুই জানো না। এমন কি এই যশোরের দুটো যুদ্ধের খবরও খুব কম জানো, অথচ তোমার সবই জানা দরকার। যদি মা যশোরেশ্বরীর কৃপায় আবার যশোররাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহলে আমার উত্তরাধিকারী হিসাবে তুমিও যশোরের রাজকার্যে যোগ দেবার সুযোগ পাবে—আমি এখনো আশা রাখি। তাই বলছি, যশোরের সকল ইতিবৃত্তই তোমার জানা উচিত। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বিষয়, তাঁব বংশপরিচয়, বা আমাদের বংশের সঙ্গে তাঁদের কি সম্পর্ক, তাও বোধহয় তুমি ভালো করে জানো না। আজ সব বলবো।"

পুব আকাশে অল্প অল্প আলো দেখা দিয়েছে। জোয়াব আসতে কিছু দেরি আছে। কিন্তু নদীর জল বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তার ফলে, নৌকোর গতিও কিছুটা কমে গিয়েছে।

মধুসূদন রায় বলে চললেন, "যশোরবাজ্য প্রতিষ্ঠা হবার বহু আগে থেকে এই রাজবংশের সঙ্গে আমাদের বংশের সম্পর্ক খুব নিকট। আমাদের দুই বংশের পূর্বপুরুষদের অনেকে একসঙ্গে বাংলার পাঠান সুলতানদের অধীনে উচ্চ রাজকর্মচারীর কাজ করেছেন। পাঠান রাজ-সরকারে কাজ করার জন্যে আমাদের পূর্বপুরুষরা কেউ কেউ 'খাঁ' বা 'রায়' উপাধি পান। কিন্তু আমাদের বংশের 'বসু', আর যশোর রাজবংশের 'গুহ' হলো আসল উপাধি। আমাদের বংশের গোপীনাথ বসু বা পুরন্দর খাঁ ছিলেন পাঠান সুলতান হোসেন শার একজন মন্ত্রী। আর মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বাবা ও কাকা দুজনেই ছিলেন বাংলার শেষ পাঠান সুলতান দাউদ খাঁর মন্ত্রী। তাঁদের দুজনের নাম ছিল শ্রীহরি গুহ ও শ্রীজানকীবল্লভ গুহ। দাউদ খাঁর বহু ধনরত্ন এঁদের কাছে থাকতো। রাজমহলের যুদ্ধে মোগলদের হাতে দাউদ খাঁ পরাজিত ও নিহত হবার পর শ্রীহরি গুহ ও শ্রীজানকীবল্লভ গুহ দু ভাই যশোরে আসেন ও যশোররাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বড়

ভাই শ্রীহরি গুহ মোগল বাদশার অধীনে যশোরে সামন্ত রাজা হলেন, তাঁর নাম হলো 'বিক্রমাদিত্য'। জানকীবল্লভের নাম হলো 'বসন্ত রায়'। বসন্ত রায়ের দক্ষতায় যশোররাজ্য দিনে দিনে উন্নত হতে লাগল।

"রাজমহল থেকে এঁরা দু ভাই যখন আসেন, তখন আমি অভিভাবকহীন বালক। বসন্ত রায় ছিলেন আমার পিতৃবন্ধু। তিনি আমাকে যশোর-রাজবাড়িতে স্থান দেন। প্রতাপাদিত্য আমার চেয়ে বয়সে কিছু ছোট ছিলেন। তাঁর ছোটবেলার নাম ছিল 'গোপীনাথ'। যুবরাজ হলে নাম হয় 'প্রতাপাদিত্য'। আমরা ছেলেবেলায় একসঙ্গে বসন্ত রায়ের কাছে রাজনীতি ও রণবিদ্যা শিক্ষা করতাম। দশ-বারো বৎসরের মধ্যে যশোররাজ্য বাংলার প্রায় শ্রেষ্ঠ রাজ্য হয়ে উঠলো। কিন্তু বাংলার ভাগ্যেও সে-সময় ঘনিয়ে এলো এক মহাদুর্যোগ।"

মধুসূদন রায় থামলেন। কয়েক মুহূর্ত পরে শোনা গেল তাঁর বিষণ্ন কণ্ঠ—যেন দূর অতীত থেকে ভেসে আসছে—"রাজমহল-যুদ্ধে মোগলসম্রাট আকবর পাঠানশক্তি দমন করে বাংলাদেশ অধিকার করেছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি বাংলাকে সম্পূর্ণ পদানত করতে পারেন নি। মোগলরা কোনদিনই পাঠানদের মতো এদেশের লোকের হৃদয় জয় করতে পারে নি। পাঠানদের সময় বাংলার জমিদাররা প্রায় স্বাধীন ছিল। কিন্তু মোগলরা অতটা স্বাধীনতা তাদের দিতে চাইল না। ফলে, বারোজন বড় বড় জমিদার বা ভুঁইয়াদের মধ্যে অনেকের মন মোগলদের উপর বিরূপ হলো। কেউ কেউ মোগল-শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন, বাদশাহ সরকারে কর দিলেন না।

"যশোরের বিক্রমাদিত্য বা বসন্ত রায় এ সব পছন্দ করতেন না, মোগল বাদশার অনুগত হয়েই থাকতেন। তাঁরা দুজনেই ছিলেন অতি ধীর ও শান্ত প্রকৃতির। কিন্তু প্রতাপাদিত্য ছিলেন ঠিক বিপরীত—অতি চঞ্চল ও উদ্ধত প্রকৃতির। তাঁর মধ্যে বীরভাবও ছিল অত্যন্ত প্রবল। বসন্ত রায় প্রতাপাদিত্যকে শান্ত ও সভ্য করার বহু চেষ্টা করেন। শেষে তিনি যশোররাজ্যের প্রতিনিধি হিসাবে

তাঁকে আগ্রায় বাদশার দরবারে পাঠালেন, যাতে তিনি সেখানে গিয়ে পাঁচজন বড় বড় লোকের সঙ্গে মিশে সংযত ও শিষ্ট হন। কিন্তু তার ফল হলো বিপরীত।

"প্রতাপাদিত্য যখন আগ্রায় মোগল দরবারে গেলেন, তখন মেবারের রানা প্রতাপের সঙ্গে আকবরের যুদ্ধের পর যুদ্ধ চলেছে। প্রচণ্ড মোগলশক্তির বিরুদ্ধে রানা প্রতাপ সামান্য কয়েকজন সৈন্য নিয়ে লড়ছেন,—রানা প্রতাপের বীরত্বে সারা ভারত মুগ্ধ। প্রতাপাদিত্য এই সব দেখে শুনে মনে মনে স্থির করলেন, 'রানা প্রতাপের মতো আমিও মোগল-শক্তির বিরুদ্ধে লড়বো। আমিই বা কম কিসে! কিন্তু এ ব্যাপারে প্রধান অন্তরায় হবেন তাঁর বাবা ও কাকা—এ কথা বুঝতে পেরে কৌশলে বাদশাহ সরকার থেকে নিজের নামে যশোররাজ্যের সনদ লিখে নিয়ে প্রতাপাদিত্য দেশে ফিরলেন।

এ খবরে বিক্রমাদিত্য দারুণ মর্মাহত হলেন। কয়েক মাস পরে তাঁর মৃত্যু হলো। বসন্ত রায় রাজধানী ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলেন। বসন্ত রায়েব ছেলে গোবিন্দ বায় প্রতাপাদিত্যকে হত্যা করার চেষ্টা করায় বসন্ত রায়ের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের মনোমালিন্য হয়। প্রতাপাদিত্য ক্রুদ্ধ হয়ে বসন্ত রায়কে হত্যা কবেন। রাজনীতিতে এ সব কাজ গর্হিত বলে তিনি মনে করতেন না। বাংলাদেশকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করবার অদম্য ইচ্ছায় এ সব তিনি করেছিলেন।

"আগ্রায় বাদশা আকবর তখন রাজপুতদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত। বাংলাদেশকে ভালো রকম শাসন করার তাঁর অবসর নেই। বাংলার বারো ভুঁইয়াদের অনেকেই তখন বাদশাকে কর দেওয়া বন্ধ করে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চলছেন। প্রতাপাদিত্য তো একাজে সকলের অগ্রণী। তিনি মোগলশক্তিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করলেন। প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করার আগে মোগল-শক্তির বিরুদ্ধে লড়বার মতো শক্তিও তিনি সঞ্চয় করলেন। এই সব সংবাদ ও বসন্ত রায়কে হত্যা করার নালিশ আগ্রার দরবারে পৌঁছলো। বাদশা আকবর মানসিংহকে

বাংলায় পাঠালেন বিদ্রোহী ভুঁইয়াদের দমন করার জন্যে—বিশেষ ভাবে প্রতাপাদিত্যকে। প্রতাপ তখন বেশ শক্তিশালী। তাঁর ষোলোটা দুর্গ, বিশ হাজার ঢালী সৈন্য, ফিরিঙ্গি গোলন্দাজ, হাতী, ঘোড়া, নৌকো, কামান, বন্দুক সবই হয়েছে। স্বাধীন রাজার মতই তিনি ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছেন।"

মধুসূদন রায় আবার থামলেন। সূর্য পুব আকাশে অনেক উপরে উঠেছে। মধুসূদন রায়কে কিছুটা চঞ্চল মনে হলো—স্মৃতির ভাণ্ডারে কি যেন খুঁজছেন তিনি। দুর্লভের উৎসুক দৃষ্টি তাঁর মুখের উপর নিবদ্ধ। নিস্তব্ধ প্রকৃতি। তালে তালে শুধু দাঁড়ের শব্দ হচ্ছে। মধুসূদন রায় আবার শুরু করলেন—বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে।

"মোগল সৈন্যরা যশোর আক্রমণ করলে। যুদ্ধ চলতে লাগলো অতি প্রচণ্ডভাবে। প্রতাপাদিত্য যে সত্যই শৌর্যশালী বীরপুরুষ, তা সকলেই বুঝলে—এমন কি মোগল সেনাপতি মানসিংহও। প্রতাপাদিত্যের বীরত্ব, যুদ্ধকৌশল আর শক্তিসম্পদ দেখে মানসিংহ মুগ্ধ হলেন। মোগল সৈন্যরা প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে পেরে উঠলো না। মানসিংহ সামান্য কয়েকটি শর্তে প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে সন্ধি করে আগ্রায় ফিরে গেলেন।

"তারপর বছর কতক বেশ শান্তিতেই কেটে গেল। কিন্তু খুব বেশী দিন নয়। এই সময় বাদশা আকবর মারা গেলেন। আগ্রার সিংহাসনে বসলেন জাহাঙ্গীর। ভারতে আবার অশান্তি দেখা গেল নানা দিক থেকে। বাদশাহ-দরবারে তখন মনোমালিন্য চলেছে জাহাঙ্গীরের বাদশা হওয়া নিয়ে। অনেকে চাইতেন না যে, তিনি সিংহাসনে বসেন। এই হলো মনোমালিন্যের কারণ। মানসিংহ তখনও জীবিত। অনেকের চক্ষে তিনিও সন্দেহজনক ব্যক্তি। এর ফলে দেশের সর্বত্র আবার বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে। বাংলার ভুঁইয়াদের অনেকে বাদশাকে অগ্রাহ্য করলেন। প্রতাপাদিত্য তো বাদশার অধীনতা স্বীকারই করতেন না। তিনি হলেন বিদ্রোহীদের মধ্যে শুধু অগ্রণীই নন, সর্বাপেক্ষা শক্তি ও সম্পদশালী।

"বাদশা জাহাঙ্গীর ইসলাম খাঁকে বাংলার সুবেদার করে বিদ্রোহী ভুঁইয়াদের দমন করতে পাঠালেন। ইসলাম খাঁর সময় বাংলার রাজধানী হলো ঢাকায়। ইসলাম খাঁ ঢাকায় এসে প্রথমেই প্রতাপাদিত্যকে ডেকে পাঠালেন, প্রতাপাদিত্য কৌশলে সময় নিয়ে নিজেকে আরও শক্তিশালী করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু দিন কয়েকের মধ্যে দেখা গেল, মোগল সৈন্যরা যশোর আক্রমণ করেছে।

"যশোরের দ্বিতীয় যুদ্ধ আরম্ভ হলো।

"এই যুদ্ধেব আগে প্রতাপাদিত্য ভেবেছিলেন, মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হলে অন্য ভুঁইয়ারা সকলে, তাঁর সহায় না হোন, নিজেরা বিদ্রোহ করবেন, আর চন্দ্রদ্বীপের ভুঁইয়া তাঁর জামাতা রামচন্দ্রের ও হিজলীর ভুঁইয়া বন্ধু ওসমান খাঁর সাহায্য তিনি পাবেন। কিন্তু দুটির কোনটিই হলো না। উপরন্তু, ভূষণার ভুঁইয়া মুকুন্দরাম ও মাটিয়ারীর জমিদার ভবানন্দ হীন স্বার্থসিদ্ধির জন্যে মোগলদের সহায় হলেন। যুদ্ধেব আরম্ভে প্রতাপাদিতা নিজে রাজধানী ধূমঘাটায় রইলেন, আর যুবরাজ উদয়াদিত্যকে শালখার দুর্গে পাঠালেন। মোগল সৈন্যরা ঐদিক দিয়ে যশোবে আসছিল।

"উদয়াদিত্য বাবার মতোই বীর ছিলেন, কিন্তু যুদ্ধে আদৌ সুবিধা করতে পারলেন না। তাব প্রধান কারণ—যুদ্ধের প্রথমেই তাঁর প্রধান সহায় কমল খোজার মৃত্যু আর জমাল খাঁর বিশ্বাসঘাতকতা। শালখার যুদ্ধে মোগলদের শুধু জয়ই হলো না, যশোর রাজকোষের বহু অর্থ ও সৈন্যদের খাদ্যসামগ্রী তাদের হস্তগত হলো। উদয়াদিত্য কোনমতে প্রাণ নিয়ে ধূমঘাটায় ফিরে এলেন। যুদ্ধের মোড় ফিরে গেল। এই সময় প্রতাপাদিত্যের শরীরও খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে,—বীর প্রতাপাদিত্য জীবনে এই প্রথম দমে গেলেন। তিনি মোগল সেনাপতি গিয়াস খাঁর সঙ্গে যুদ্ধ স্থগিত রাখবার চুক্তি করে ঢাকায় ইসলাম খাঁর কাছে সন্ধির প্রস্তাব করতে গেলেন।

"মহারাজা ঢাকায় যাবার আগে যুবরাজ উদয়াদিত্যের হাতে

যশোরের ভার দিলেন। আর আমাকে তাঁর একটা গুপ্ত ঘরে নিয়ে গিয়ে এই সিন্দুকটা দেখিয়ে বললেন, 'আপনি শুধু আমার বিশ্বস্ত কর্মচারীই নন, আপনি আমার আবাল্য বন্ধু—নিকট-আত্মীয়ের মত। এই সিন্দুকটি আপনার কাছে গচ্ছিত রেখে যাচ্ছি। এর মধ্যে কি আছে, তা এখন আপনাকে বলবো না। মা যশোরেশ্বরীর কৃপায় যদি কোনদিন আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তখন আপনার কাছ থেকে এ সিন্দুক ফিরিয়ে নেব। এর মধ্যে সব কথাই লেখা রইল। সিন্দুকের চাবি ও আমার আদেশ-পত্র একসঙ্গে রইল, বিশেষ প্রয়োজন না হলে খুলবেন না। সিন্দুকটি নিরাপদে রাখা ও যথাস্থানে ফেরত দেবার জন্যে যদি রাজধানী থেকে অন্যত্র যাওয়া দরকার মনে করেন, তাহলে উপযুক্ত ব্যক্তির উপর আপনাব কাজের ভার দিয়ে যেতে পারবেন। আপনি এখন ধূমঘাটার দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ-রক্ষকেরও কাজ করবেন।"

বলতে বলতে অশ্রুতে মধুসূদন রায়ের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো। একটু থেমে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি আবার শুরু করলেন, "মহারাজা মোগল সেনাপতি গিয়াস খাঁর সঙ্গে ঢাকায় চলে যাবার পর মোগল সৈন্যদের সেনাপতি হলেন সোহন মীর্জা। লোকটি অতি বদ স্বভাবের। বিনা কারণেই সে যশোরের লোকদের উপর নানারকম অত্যাচার শুরু করলে। এই সময় যশোবে খবর রটলো, ঢাকায় প্রতাপাদিত্য গেলেই তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। সন্ধি হয় নি। মোগল সেনাপতি সোহনের বিক্রম বেড়ে গেল। উদয়াদিত্য তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ না করে পারলেন না। কিন্তু যুদ্ধ বন্ধ থাকবে ভেবে যশোরের বহু সৈন্য এ সময় রাজধানীতে ছিল না। যুদ্ধে উদয়াদিত্যের পরাজয় ও মৃত্যু ঘটলো। মোগল সৈন্যরা রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করলে। তখন রাজ-প্রাসাদের রক্ষী-সৈন্যও সংখ্যায় কম ছিল। তারা মোগলদের সঙ্গে পেরে উঠলো না। শেষ পর্যন্ত আমি আর মহারাজার কিশোরবয়স্ক পুত্র রামভদ্র মোগল সৈন্যদের রাজপ্রাসাদের অন্দরমহলে যাবার পথে প্রাণপণে বাধা দেবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ব্যর্থ হলাম।"

মধুসূদন রায়ের দু চোখ বেয়ে তখন অশ্রুধারা নেমেছে। নতনেত্রে নদীর স্রোতের দিকে তাকিয়ে থেকে তিনি বলতে লাগলেন যেন আপন মনেই, "যশোররাজ্যের গৌরব-সূর্য যখন মধ্যাহ্ন-গগনে, তখনি অমাবস্যার অন্ধকার সব গ্রাস করবে, এ যে স্বপ্নেরও অতীত ছিল।··· মহারানী এবং রাজপরিবারের অন্যান্য মহিলা ও শিশুরা কেমন ভাবে নদীতে আত্মবিসর্জন করেছিলেন, তা আগেই বলেছি। মোগল সৈন্যরা যখন রাজপ্রাসাদ লুঠ করে চলে গেল, তখন আমি অচৈতন্য আর রামভদ্র মৃত।—উঃ! আমি কেন রইলাম!···

"বোধহয় একদিন পরে জ্ঞান ফিরে পেয়ে প্রথম ছুটলাম সেই গুপ্ত কক্ষে যেখানে এই সিন্দুকটা ছিল। দেখলাম, এটা ঠিকই আছে, মোগল সৈন্যরা দেখতে পায় নি। চরম শোকের মধ্যেও মনে একটু শান্তি পেলাম, মহারাজার শেষ আদেশটা পালন করতে পারবো মনে করে।

"এখন এই সিন্দুকটা মহারাজাব দ্বিতীয় রাজধানী সাগরদ্বীপে নিয়ে নিরাপদে রাখতে পারলে, বোধহয় তাঁর আদেশ পুরোপুরি পালন করতে পারবো। আমার মনে হয়, সাগরদ্বীপ এখনও মোগলদের হাতে যায় নি। আমরা এখন সেখানে গিয়ে উঠবো, পরে পরিবারের সবাইকে সেখানে নিয়ে যাবো। তারপর মা যশোরেশ্বরী যদি কৃপা করেন তো, আবার সেই যশোরে সেই ধূমঘাটায় মহারাজার রাজ্যে সকলে ফিরে যাবো।"

মধুসূদন রায় থামলেন।

··· ··· ···

বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর। নদীতে জোয়ার এসে গেল। নদীর জল ফুলে ফুলে উথলে উথলে উঠছে। মাঝিরা মৃদঙ্গভাঙা নদীর পুব তীরে একটা বেশ ফাঁকা জায়গায় নৌকো নোঙ্গর করলে।

জায়গাটা বেশ উঁচু। বনজঙ্গল এমন কি ঝোপঝাড়ও নেই। কাছাকাছি লোকালয় আছে বোঝা যায়।

নদীটা এখানে বাঁক নিয়েছে। নদীর তীরে উঁচু বাঁধ। তারপর বিরাট ফাঁকা মাঠ। মাঠের প্রথমেই একটা একতলা বাড়ি ও একটা ভাঙা মন্দির। খুব দূরে দূরে দু-একটা গ্রাম ও গভীর বনের রেখা পাড়ের উপর থেকে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

মাঝি ও নৌসেনারা স্নান, রান্না-খাওয়া আরম্ভ করলে। একজন মাঝি মধুসূদন রায়কে বললে, "হুজুর, আমরা প্রায় সাগরদ্বীপের কাছাকাছি এসে গেছি। পশ্চিমে কাকদ্বীপ, সামনে দক্ষিণে হার্মাদখালি। এ জায়গাটা আমি চিনি—এদিকটায় হার্মাদ বা বোম্বেটে জলদস্যুদের উৎপাত খুব বেশী। এখন আর আমরা নৌকো চালাবো না। রাতের আঁধারে নৌকো ছাড়বো। আর দুটো ভাটা পেলেই সাগরদ্বীপে পৌঁছে যাবো।"

মধুসূদন রায় ও দুর্লভ নদীর তীরে উঠে এলাকাটা ভালো করে দেখতে লাগলেন। চারিদিক নির্জন—জনশূন্য। হঠাৎ তাঁরা চমকে উঠলেন, দেখলেন—বিস্তৃত মাঠের ভিতর দিয়ে একজন লোক তাঁদের দিকে ছুটে আসছে।

মধুসূদন রায় একটু চিন্তিতভাবে দুর্লভকে বললেন, "লোকটা কি উদ্দেশ্যে এদিকে আসছে বুঝতে পারছি নে। আমার বন্দুকটা নিয়ে এসো। নিজের জন্যেও একটা কিছু হাতিয়ার এনো।"

দুর্লভ ছুটে গিয়ে নৌকো থেকে বন্দুকটা ও একটা তলোয়ার নিয়ে এলো।

লোকটা এগিয়ে আসছে ঊর্ধ্বশ্বাসে। সে আরও কিছুদূর এগিয়ে এলে, মধুসূদন রায় বন্দুকটা হাতে নিয়ে তাকে উদ্দেশ করে বললেন, "ঐখানে থামো, আর এগিও না। ঐখান থেকে বল, কি উদ্দেশ্যে এদিকে আসছ?"

লোকটি বৃদ্ধ। হাঁফাতে হাঁফাতে কাতর কণ্ঠে বললে, "আমি আপনাদের সাহায্যপ্রার্থী। আমাদের সর্বনাশ হতে চলেছে,—হার্মাদ জলদস্যুরা আমাদের গ্রামে ঢুকে যত ছেলেমেয়ে পারছে, ধরে নিয়ে

যাচ্ছে। আমার একটা নাতনীকেও ওরা বেঁধেছে। এখন আপনারা হয়তো রক্ষা করতে পারেন, তাই দূর থেকে আপনাদের নৌকোর পাল দেখে ছুটে আসছি।"

মধুসূদন রায় বৃদ্ধটিকে কাছে আসতে বলতেই, সে এসে তাঁর পায়ের কাছে ধপ্ করে বসে পড়লো। সে হাঁফাচ্ছে ভীষণভাবে। দুর্লভ বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলে, "হার্মাদরা কজন? কতদূর আপনাদের গ্রাম?"

বৃদ্ধটি উত্তর দিলে, "জলদস্যুবা সংখ্যায় তিনজন। আমাদের গ্রাম বেশী দূরে নয়—ঐ যে হেঁতাল জঙ্গল দেখছেন, ওর রশিখানেক পর খাঁড়ির ধারেই আমাদের বাড়ি। যদি দয়া করেন তো আপনারা আর বিলম্ব করবেন না—হার্মাদরা এক্ষনি ছেলেমেয়েদের নিয়ে ওদের বজরায় তুলবে, বড় নদীতে তাদের বজরা দেখে এসেছি। দেশে একটাও শক্তসমর্থ লোক নেই, সবাই মহাবাজ প্রতাপাদিত্যের ডাকে মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে রাজধানীতে গেছে। এখন ভগবান বোধহয় আপনাদের পাঠিয়েছেন গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের রক্ষা করতে।"

বৃদ্ধের দু চোখ বেয়ে জলের ধারা নামলো।

মধুসূদন রায় দুর্লভকে বললেন, "একথা শুনে আর চুপ করে থাকা যায় না। এসো, আমরা বেরিয়ে পড়ি। নৌসেনাদের যারা ভালো সড়কি চালাতে পারে, এমন ঢালী জন দুই আমাদের সঙ্গে থাক। আমার মনে হয়, তাতেই হবে।"

দুর্লভ বললে, "আমার মনে হয়, হার্মাদরা তাদের বজরা যেখানে রেখেছে, সেই ঘাটে আমাদের যাওয়া উচিত। ওরা ছেলেমেয়েদের নিয়ে তীরের কাছে গেলেই, আমরা বাঁধের পিছন থেকে হঠাৎ ওদের আক্রমণ করবো।"

মধুসূদন রায় বললেন, "ঠিকই বলেছ। আমরা সবাই আত্মগোপন করে ঐ দিকে যাবো, ওদের কাছে সব সময় বন্দুক থাকে।"

হরিণখালি গ্রাম যশোররাজ্যের অধীনে। লোকের বাস নেহাত মন্দ নয়। কিন্তু গ্রামে যুবক কেউ নেই—সবাই গেছে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের হয়ে মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। সেই সুযোগে হার্মাদ বা পর্তুগীজ জলদস্যুদের তিনজন গ্রামে ঢুকেছে; এবং দশ-বারোটি ছেলেমেয়ে ধরে তাদের প্রত্যেকের হাতের চেটো পেরেক দিয়ে ফুটো করে তার মাঝ দিয়ে একটা দড়ি ঢুকিয়ে শক্ত করে বেঁধে দড়িটা মহাস্ফূর্তিতে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে। ছেলেমেয়েদের হাত থেকে অঝোরে রক্ত ঝরছে, তারা যন্ত্রণায় আর প্রাণভয়ে চিৎকার করে কাঁদছে। তাদের মা-বোনেরাও বুক চাপড়ে কাঁদছে। কেউ কেউ প্রাণের মায়া ত্যাগ করে এগিয়ে যাচ্ছে। আর হার্মাদদের যার যার হাতে বন্দুক, তারা ওদের গুলি করবার ভয় দেখাচ্ছে। তবুও তারা হটছে না।

দুম্!—হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ হলো।

বন্দুকধারী হার্মাদটি মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। তার বন্দুকটা অপর একজন দস্যু কুড়িয়ে নিতে যেতেই, 'ঔফ্!' বলে সে-ও শুয়ে পড়লো—তার পিঠে সড়কি ঢুকেছে। অবশিষ্ট হার্মাদটি এই রকম আকস্মিক বিপর্যয়ে বেসামাল হয়ে বন্দী ছেলেমেয়েদের এমন কি বন্দুকটা ফেলে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলো ওদের বজরা যে ঘাটে আছে সেই দিকে। এসে দেখলে, ঘাট ফাঁকা—বজরা মাঝ নদীতে ভাসছে! নিরুপায় হার্মাদ নদীতে ঝাঁপ দিলে।

দুর্লভ আগেই বোম্বেটে বজরার নোঙরের দড়ি কেটে দিয়েছিল।

বোম্বেটেদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে ছেলেমেয়েরা মহা আনন্দে বাড়ি ফিরে গেল। তাদের মা-বোনেরা আর সেই বৃদ্ধ এলো মধুসূদন রায় ও দুর্লভকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাতে। বৃদ্ধটি আনন্দে আত্মহারা হয়ে মধুসূদন রায়ের পা জড়িয়ে ধরতে যেতেই, বাধা দিয়ে মধুসূদন রায় তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "মানুষের কর্তব্য যা

তাই করেছি ভাই, তার বেশী কিছু করি নি। সবই ভগবানের ইচ্ছা। আমিও আজ তোমাদের মতো অসহায়—আমাকে মস্ত বড় কিছু বলে মনে করো না।"

মধুসূদন রায় ও দুর্লভদের সকলকে বৃদ্ধ বাড়ি নিয়ে গেল।

বৃদ্ধটি পরিচয় দিলে, সে ও তার ভাই দুজনে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের অধীনে কাজ করে। সে নিজে এই অঞ্চলের একজন ঘাঁটিদার বা দারোগা নাম গয়ারাম হাতী। আর তার ভাই জয়রাম হাতী মহারাজার মনিরতট দুর্গের রক্ষক।

মধুসূদন রায় বৃদ্ধের হাত দুটো চেপে ধরে বললেন, "তাহলে আপনাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে বলতে হবে। আমিও মহারাজার একজন কর্মচারী।"

গয়ারাম হাতী জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার নাম?"

"মধুসূদন রায়।"

গয়ারাম হাতী উৎফুল্ল ও বিস্মিত হয়ে বললেন, "মীরবহর মধুসূদন রায়! আপনাকে দেখে প্রথমে তাই মনে হয়েছিল। পরক্ষণে মনে হলো, এসময় আপনি ধূমঘাটা রাজধানী ছেড়ে আসবেন কি করে?"

"আর ধূমঘাটা—রাজধানী!"

মধুসূদন রায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে নীরব হয়ে গেলেন। রক্তঝরা স্মৃতির বেদনায় তিনি বিচলিত। দুর্লভের কাছে গয়ারাম হাতী স্তব্ধ হয়ে সব কথা শুনলেন। অন্যেরাও শুনলো। গয়ারামের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। শেষে আত্মসংবরণ করে ধীরে ধীরে তিনি বললেন, "সবই তো শুনলুম! ধূমঘাটার যা অবস্থা, সাগরদ্বীপেরও তাই। সাগরদ্বীপও মোগল সেনারা অধিকার করেছে, আজ খবর পেয়েছি।"

"তাহলে উপায়?" আত্মগতভাবে মধুসূদন রায় বললেন।

গয়ারাম বললেন, "একটা উপায় আছে,—আপনারা এই গ্রামেই থেকে যান। নদীর তীরে যে বাড়িটা আপনারা দেখেছেন, ওটা হলো

মহারাজার ফিরিঙ্গিখানা। আর যে বড় মাঠটা পার হয়ে এলেন, সেটা হলো মহারাজারই ঘোড়াছুটের মাঠ। এ সবই মহারাজার খাস সম্পত্তি। আপনি এগুলি এখন দখল করুন। তারপর যশোরে ফিরে যেতে চান যাবেন; আর যদি থাকতে চান তো যশোর রাজসরকার থেকে ব্যবস্থা করে নেবেন।"

গয়ারাম হাতীর কথাটা মধুসূদন রায় ও দুর্লভের মনঃপুত হলো। এছাড়া আর উপায়ই বা কি আছে? একটা বাসস্থান চাই এবং সিন্দুকটাকেও নিরাপদে রাখতে হবে।

মধুসূদন রায় নদীর তীরে এসে সেই বাড়িতে স্থায়ীভাবে উঠলেন। নৌসেনারা অনেকে তাঁর সঙ্গে থেকে গেল।

কিছুদিন পরে মধুসূদন রায়ের পরিবারবর্গও সেখানে এসে গেল। তাঁর সব কাজেই প্রধান সহায় হলেন গয়ারাম হাতী। তিনখানা গ্রামের মোড়ল বা কর্তা তিনি। লোকটা সত্যই খুব ভালো ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী। তাছাড়া, মধুসূদন রায়ের কাছে গয়ারাম কৃতজ্ঞ ও একান্ত অনুগত।

স্থায়ী বাসিন্দা হয়েই মধুসূদন রায় প্রতাপাদিত্য বা তাঁর পুত্র-পৌত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ করবার বহু চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন—কেউই মহারাজা বা তাঁর বংশধরদের কোন সঠিক সন্ধান দিতে পারলে না।

নানা রকম জনরব রটছিল লোকের মুখে মুখে। কেউ বলে, মহারাজ প্রতাপাদিত্য সন্ধির জন্যে ঢাকায় যাওয়ামাত্র মোগল সুবাদার ইসলাম খাঁ তাঁকে হত্যা করে তাঁর দেহ তেলে ভেজে আগ্রায় বাদশা জাহাঙ্গীরের কাছে পাঠিয়েছে। কেউ বলে, তা নয়, ইসলাম খাঁ প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করে লোহার খাঁচায় পুরে গরুর গাড়ি করে আগ্রায় পাঠায়; আগ্রার পথে কাশীতে মহারাজার মৃত্যু হয়। কোন খবর যে ঠিক, তা কেউ জোর করে বলতে পারে না। মহারাজার ছেলেদের সম্পর্কেও নানা রকম গুজব চলেছে। কেউ বলে, মহারাজার বংশের কেউ জীবিত নেই। আবার কেউ কেউ বলে,

তাঁর একটি ছেলে এখনও জীবিত আছে, মোগল সৈন্যরা তাকে ধরে পাটনায় নিয়ে গিয়ে মুসলমান করেছে। এই সব গুজবের মধ্যে একটা কথা কিন্তু সবাই জানলো এবং তা সত্য। সেটা হলো, মহারাজা প্রতাপাদিত্য ঢাকা থেকে আর যশোরে ফেরেন নি, আর যশোররাজ্য এখন বসন্ত রায়ের ছেলে কচু রায়ের অধীনে। দুর্লভ রায় ছদ্মবেশে নিজে যশোরে গিয়ে দেখে এসেছেন।

মধুসূদন রায় উদ্যোগী ও কর্মী পুরুষ। তাঁর হাতে কিছু অর্থও ছিল আর ছিল গয়ারাম হাতীর মতো লোক প্রধান সহায়। এই সব মিলে তখনকার অরাজক সময়ে দূর পল্লীঅঞ্চলে সেই ঘোড়াছুটের মাঠকে কেন্দ্র করে বহু জমি ও কয়েকখানা গ্রামের মালিক হতে মধুসূদন রায়ের বেশী সময় লাগলো না। কিছু দিনের মধ্যে এই অঞ্চলে তিনি একজন বড় জমিদার হয়ে উঠলেন। তাঁর নিজের বসত গ্রামের নাম দিলেন 'মীরবহরপুর'।

দেখতে দেখতে বৃদ্ধ মধুসূদন রায়ের তিনমহল বাড়ি হাতী ঘোড়া লোকজন খ্যাতিপ্রতিপত্তি, সবই হলো। কিন্তু মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সেই সিন্দুক তাঁকে বা তাঁর কোন বংশধরকে ফিরিয়ে দেওয়া তাঁর জীবনে ঘটলো না, দুর্লভ রায়েরও না।

দুর্লভ রায় শেষ জীবনে নদীর তীরে একটা বিরাট শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই মন্দিরের একটা গোপন স্থানে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সেই সিন্দুকটি তিনি পুঁতে রাখলেন, আর মহারাজার আদেশ-পত্রটি তাঁর জমিদারীর কাগজপত্রের সঙ্গে যত্ন করে রেখে দিলেন।

তারপর—

তারপর প্রায় আড়াইশো বছর কেটে গেছে। এই সময়ের মধ্যে সারা ভারতের উপর দিয়ে কল্পনাতীত দুর্বিপাক বয়ে গেছে। ভয়ঙ্কর ও শোচনীয় বিদ্রোহ, বিপ্লব ও যুদ্ধের আগুনে বারবার দেশ ছারখার হয়েছে,

রক্তের বন্যা বয়েছে। মহামারী-মন্বন্তরে অঞ্চলকে অঞ্চল জনশূন্য গভীর জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। আর এই সময়ের মধ্যেই ভারতে বহু রাজ-শক্তির উত্থান, পতন ও পরিবর্তনও ঘটেছে।

বাংলার বীর সন্তান প্রতাপাদিত্য ও বিদ্রোহী ভুঁইয়াদের নাম আজ দেশের লোকের কাছে বিস্মৃতপ্রায়। ভুঁইয়াদের মধ্যে যাঁরা মোগল-শক্তির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্রমে অস্ত্র ধরেছিলেন, তাঁদের বংশধরেরা আজ শক্তিহীন খ্যাতিহীন নির্জীব। কেউ কেউ সামান্য জমিদারীর মালিক। আর সেই দুর্ধর্ষ মোগল বাদশাবা—যাঁরা দোর্দণ্ড প্রতাপের সঙ্গে প্রায় সারা ভারতের উপর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রাজত্ব করেছিলেন, তাঁদেবও শক্তি ধীরে ধীরে হ্রাস পেয়েছে। আর সেই অরাজকতার সুযোগে পূর্ব-দমিত বিদ্রোহীরা বার বার মাথা তুলেছে। বাদশাদের নিযুক্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা নবাবেরা নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। বিদেশী ইংরেজ বণিকেরাও এ সুবর্ণ সুযোগ হেলায় নষ্ট করে নি। ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে দেশের বুকে তারা ঘাঁটি গেড়েছে—বহু স্থানে নিজেদের অধিকার কায়েম করেছে। শেষ পর্যন্ত তাদের হাতেই বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব পলাশীর মাঠে পরাজিত হলেন। দিল্লীর বাদশা ইংরেজশক্তিকে দমন করতে পারলেন না—সে ক্ষমতা তখন আর তাঁর নেই। ভারতের শেষ স্বাধীন বাদশা ইংরেজ বণিকদের দ্বারা সিংহাসনচ্যুত ও সুদূর বর্মায় নির্বাসিত হয়ে ইংরেজদেরই দয়ার অন্ন ভোগ করতে করতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মোগলশক্তির পতনের সঙ্গে সঙ্গে ধূর্ত ইংরেজ বণিকের দল ছলে বলে কৌশলে অল্প অল্প করে প্রায় সারা ভারতবর্ষ গ্রাস করলো। তারপর এরা অর্থাৎ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রায় এক শতাব্দী ধরে শাসনের নামে ভারতবর্ষের বুকে চরম শোষণ ও বীভৎস অত্যাচার-অবিচার চালালো, যার ফলে দেশের সর্বত্র দেখা দিল অশান্তি, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী। আত্মকলহে ছিন্নভিন্ন শক্তিহীন ভারত নির্জীবের মতো সেসব সহ্য করে গেল, বিদ্রোহ করবার মতো একতা বা শক্তি তার ছিল না।

তবুও শেষ পর্যন্ত একদিন দেখা দিল প্রচণ্ড বিদ্রোহ। এবং তা এলো সিপাহীদের মধ্যে। সে আগুনে ভারতপ্রবাসী ইংরেজদের অনেকে প্রাণ হারানোর ফলে ইংরেজের টনক নড়লো,—তার স্বার্থে ঘা পড়লো, জঘন্য কলঙ্ক রটলো ইংরেজ জাতির বিরুদ্ধে, যার খবর বিলাতেও পৌঁছলো। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট স্বহস্তে ভারত-শাসনের ভার নিলেন। বুদ্ধিমান চতুর ইংরেজ ভারতকে বংশ-পরম্পরায় ভোগদখল করতে চায়। নিজেদের স্বার্থেই তারা বুঝলে, ভারতবাসীকে কোনমতে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তার জন্যে দেশে কিছু আইনকানুন, আপাত সুশাসন ও শৃঙ্খলা দরকার। নতুন শাসকেরা এটা বুঝেছিলেন বলেই দেশ শাসনের অন্যরকম ব্যবস্থা করলেন। দেশে কতকটা শান্তি ফিরে এলো।

এই আড়াই শো বছর ধরে বাংলাদেশের উপর দিয়েও অতি শোচনীয় সর্বনাশ ও বিপর্যয় গিয়েছে—মধুসূদন রায়ের প্রতিষ্ঠিত মীরবহরপুরও তা থেকে বাদ যায় নি।

মীরবহরপুরের জমিদার রায়দের পূর্বের সে প্রতাপ নেই। প্রচণ্ড ভূমিকম্পে ও জলপ্লাবনে তাঁদের জমিদারীর বহু অংশ লোপ পেয়েছে। বড় বড় নদীর ধারের গ্রামগুলির প্রজারা মগ-ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের অত্যাচারে বাস ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে। সে সব গ্রাম বহুদিন জন-মানবশূন্য অবস্থায় থেকে গভীর জঙ্গলে ভরে গেছে। সেখানে দিনের বেলায়ও বাঘ চরে বেড়ায়। ভূমিকম্পে মীরবহরপুরের রায়দের শুধু জমিদারীর ক্ষতিই হয় নি, তাঁদের তিনমহল বাড়ির অনেকটা হঠাৎ ভেঙে পড়ায় জমিদার বংশের প্রায় সকলের জীবন্ত সমাধি ঘটেছে।

এই মহা দুর্যোগের হাত থেকে শুধু রক্ষা পেয়েছেন রাঘবনারায়ণ রায় ও তাঁর নিজের পরিবারবর্গ আর জমিদার বাড়ির একটা মহল। দুর্লভ রায়ের প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির ও বিগ্রহ ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

জমিদার রাঘব রায়ের দাপটে বাঘে হরিণে এক ঘাটে জল খায়

কি না, জানা নেই, তবে তাঁকে 'যে এই অঞ্চলের লোকেরা ভয় ও ভক্তি করে আর তাঁর প্রজারা যে তাঁকে রাজা রাঘব রায় বলে সম্মান দেখায়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। রাঘব রায় জমিদার হিসেবে দুর্দান্ত। কিন্তু প্রজাবৎসল বলে তাঁর সুখ্যাতিও যথেষ্ট।

বাংলাদেশে এখন কোন রাজনৈতিক গোলযোগ নেই। কারণ দেশবাসী শক্তিহারা। বাংলার দক্ষিণ অঞ্চলে জলদস্যুদের উৎপাতও আর নেই। আওরঙ্গজেবের সময় বাংলার শাসনকর্তা শায়েস্তা খাঁ তাদের দমন করে গেছেন।

কিন্তু কিছুদিন থেকে অন্য এক উৎপাত সারা বাংলাদেশে শুরু হয়েছে, যার ফলে দেশেব লোকের, বিশেষত চাষীদের অবস্থা হয়েছে অতি ভয়াবহ শোচনীয়।

নীলকুঠির সাহেবদের অত্যাচারে বাংলার লোকদের জীবনযাত্রা অচল হবার উপক্রম হয়েছে। তারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। নীলকুঠির সাহেবরা চায়, সারা বাংলাদেশের সব ভালো ভালো জমিতে তারা নীল চাষ করবে। টাকার জোরে বা অস্ত্রবলে, যে কোন উপায়ে হোক তাবা তা করবেই। কুঠির সাহেবরা রাজার জাত—দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তাদেব হাতে অস্ত্রশস্ত্র, আইন-আদালত। দেশবাসীও অশক্ত বীর্যহীন। তার উপর এদেশের লোকদের উপর অত্যাচার করলে সাহেবরা আইনে দণ্ডনীয় হয় না। ফলে, নীলকুঠির সাহেবদের অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলছিল।

বাংলার দক্ষিণ অঞ্চলেও বহু নীলকুঠি গড়ে উঠেছে। জনকয়েক কুঠিয়াল এ অঞ্চলে আরও জমি চায়। তাদের দৃষ্টি পড়লো মীরবহর-পুরের রায়দের ভালো ভালো জমিগুলোর উপর। জমিগুলো বেশ উঁচু বাঁধ দিয়ে ঘেরা—নদীর নোনা জল ঢুকতে পারে না। লোকেরও বসবাস আছে, কুলী-মজুরের অভাব হবে না। তিন দিকে নদীপথ আছে, ফলে শহরে আসা-যাওয়া, মাল আনা-নেওয়ার সুবিধাও প্রচুর।

বেলা সেদিন প্রায় দ্বিপ্রহর। জমিদার রাঘব রায় তাঁর কাছারি ঘরের গদীর উপর বসে প্রজাদের মকদ্দমার বিচার করছেন। বাদী-বিবাদী দু পক্ষের প্রজাব দল তাঁর সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে যে যার বক্তব্য বলছে। রাঘব রায় গম্ভীরভাবে সব শুনছেন আর মাঝে মাঝে পালকের কলম দিয়ে তুলট কাগজে কি সব টুকে নিচ্ছেন।

হঠাৎ কাছারি মহলের দরোয়ান-পাইকদের মধ্যে একটা চাপা সোরগোল উঠলো। প্রজারা এদিক ওদিক চাইতে লাগলো।

একটু পরেই সাতগাঁর নীলকুঠির মালিক ডিমোলো সাহেব আব তার দেওয়ান ফকরে মার্টিন কাছারি ঘরে ঢুকে সোজা রাঘব রায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

কাছারির নায়েব-গোমস্তারা এমন কি দেওয়ান পর্যন্ত একটু ত্রস্ত হয়ে উঠলেন।

রাশভারী রাঘব রায় সাহেবকে একবার আড়চোখে দেখলেন, কোন প্রকার অভিবাদন করলেন না। সাহেব করমর্দন করবার জন্যে হাত বাড়ালেও রাঘব রায় নিজের হাত না বাড়িয়ে তাকে ফরাশের ওপর গোমস্তাদের সঙ্গে বসবার ইঙ্গিত করে আবার বিচার করতে লাগলেন।

ডিমোলো অধীর প্রকৃতির লোক, তায় আবার সাহেব। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই ফরাশের উপর সে বসে নি। কিছুক্ষণ অস্থির ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে রাঘব রায়কে বললে, "রয়, হামার ওঢিক সময় নাই, এখনি টুমার সাটে একটা কটা শেষ কড়িতে চাই।"

বিরক্ত হয়ে রাঘব রায় জিজ্ঞাসা করলেন, "কি কথা?"

ডিমোলো উত্তর দিলে, "হামি টুমার কিছু জমিটে নীল চাষ কড়িতে চায়। হামি বহুত রূপিয়া দিয়ে জমি পট্টন নিবে।"

কৃষকদের উপর নীলকুঠির সাহেবদের বহু অত্যাচারের কাহিনী রাঘব রায় শুনেছেন, নিজেও কিছু কিছু দেখেছেন। তিনি মাথা নেড়ে উত্তর দিলেন, "নাঃ, নীল চাষের জন্যে আমি এক ছটাক জমিও তোমাকে দেব না, তুমি যেতে পার।

ডিমোলো সাহেব খুব উদ্ধত প্রকৃতির লোক, কিন্তু রাঘব রায়ের বলবিক্রমের কথা সে জানে, তাই নরম ভাবেই তাঁকে বোঝাতে লাগল —জমি পত্তন দিলে বহু টাকা সেলামী হিসাবে জমিদাররা পায়। জমিদারীর মধ্যে নীল চাষ হলে প্রজাদের আর্থিক উন্নতি হবে। যারা কুলীর কাজ করবে তারা মাসে চার-পাঁচ টাকা মাহিনা পাবে, দেওয়ানরা পাবে মাসে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ টাকা। তাছাড়া আমিন, মুৎসদ্দী, পাইক-পেয়াদা—বহু লোক এই জমিদারী থেকে নেওয়া হবে, দেশে বেকার লোক আর থাকবে না, চুরী-ডাকাতি হবে না, প্রজারা খুব সুখে থাকবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

রাঘব রায় গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "আমার প্রজাদের আমি সুখেই রেখেছি, তোমাকে তাদের কথা ভাবতে হবে না; আর আমার টাকারও খুব দরকার নেই। নীল চাষের জন্যে আমি জমি পত্তন দেব না।"

রাঘব রায়ের সাফ জবাবে ডিমোলো সাহেব আর ধৈর্য রাখতে পারলে না, উদ্ধত ভাবে বললে, "জানো, হামি ড়াজার জাট, হামি খুশী মট টুমার সব জমি ডখল কড়িতে পারি জোর জলুমসে।"

রাঘব রায়ও উত্তপ্ত কণ্ঠে বললেন, "তা পার না। এখনকার লাট সাহেব নীল কুঠিয়ালদের অত্যাচার জবরদখল আদৌ পছন্দ করেন না। তিনি এসব দমন করবেন, ঠিক করেছেন।"

ডিমোলো সাহেব তাচ্ছিল্যের স্বরে বললে, "টুমি একটা বিয়াকুব, টাই ইহা বলিটেছ। লাট সাহেব ক্যানিং হামার জানা লোক—ডোস্ট, বলিলেই হয়। সে কুঠিয়াল সাহেবডের ডমন আডৌ কড়িতে চাহে না। আড়ও, সে টুমার মত বড্ লোকডের জন্য 'মুগুড় আইন' কড়িয়াছে। জমি না ডিলে টুমাকে কয়েদ কড়িতে বা চাবুক পিটিতে পাড়ি।"

রাঘব রায় উত্তেজিতভাবে বললেন, "সাহেব, তুমি এক্ষনি কাছারি থেকে বেরিয়ে যাবে, না আমার পেয়াদা তোমাকে কান ধরে বের করে দেবে?"

কি এতদূর স্পর্ধা একটা নেটিভের !

ডিমোলো সাহেব রাগে জ্বলে উঠে তার দেওয়ানকে আদেশ করলে, "ফক্‌রে, জলদি হামার শ্যামচাঁদ চাবুকটা লে আও! হামি এই রয় কুত্তাটাকে—"

ঠাশ্‌ !

সাহেবের কথা শেষ না হতেই তাকে মেঝের উপর শুয়ে পড়তে হলো। রাঘব রায়ের এক চড়ে তার লাল মুখের উপর তিন-চারটে নাল নীল দাগ পড়েছে রাঘব রায়ের বলিষ্ঠ আঙ্গুলের! কাছারির সর্দার পাইক সময় বুঝে গুলবাঁধা খেঁটে লাঠি নিয়ে এসে সাহেবের ঠিক সামনে দাঁড়িয়েছে—সাহেব যদি কিছু করতে চেষ্টা করে, তাহলে লাঠির এক ঘায়ে তার মাথা ভেঙে দেবে।

ফক্‌রে মার্টিন চাবুক নিয়ে ঘরে ঢুকতেই রাঘব রায় পাইককে হুকুম দিলেন, "এই তেয়রটাকে কান ধরে সারা গ্রাম ঘোড়ছুট করিয়ে এনে তিন দিন ঠাণ্ডা গারদে আটক রাখবি। যা, নিয়ে যা।"

পাইকরা ফক্‌রে মার্টিনকে কান ধরে টানতে টানতে কাছারি মহলের বাইরে নিয়ে গেল।

একটু পরে ডিমোলো সাহেব গালে হাত বুলুতে বুলুতে গম্ভীরভাবে কাছারি ত্যাগ করলে।

রাঘব রায় আবার প্রজাদের মকদ্দমার বিচার করতে লাগলেন স্থির ভাবেই।

কিন্তু এর পর থেকে লাগলো রাঘব রায়ের সঙ্গে কুঠিয়াল সাহেবদের বিবাদের পর বিবাদ।

রাঘব রায়ের প্রচণ্ড চড় খেয়ে যে কুঠিয়াল ডিমোলো সাহেব কাছারির মেঝেয় গড়াগড়ি খেয়েছিল, সে ছিল অতি দুর্দান্ত ও শয়তান প্রকৃতির লোক, পর্তুগীজ জলদস্যুদের বংশধর। তার দেওয়ান ফক্‌রে মার্টিন লোকটি যেমন চতুর তেমনি হিংস্র। জাতিতে সে তিয়র। নেটিভ খ্রীশ্চান। একটা হাইসের দেওয়ান। মাসিক মাইনে চল্লিশ

টাকা পায়। এজন্যে সে শুধু নিজেকে মস্ত লোক ভাবে তাই নয়, রাজার জাত বলেও মনে করে নিজেকে।

রাঘব রায়ের হাতে যে চূড়ান্ত অপমান তাদের হয়েছিল, তার প্রতিশোধ নেবার জন্যে ডিমোলো ও ফকরে মার্টিন কাছাকাছি অন্যসব কুঠিয়াল সাহেবদের কাছে যাতায়াত আরম্ভ করলে। যথেষ্ট শক্তিশালী না হতে পারলে দুর্দান্ত রাঘব রায়ের সঙ্গে পেরে ওঠা অসম্ভব—এটা বুঝে তারা দল পাকাতে শুরু করলে।

মীরবহরপুরের কিছু দূরে অন্য এক জমিদারের এলাকায় দু বছর হলো একটা নীলকুঠি হয়েছে। সে কুঠির মালিক সি. প্যারেরা। সে-ও জাতে পর্তুগীজ। স্বভাব-চরিত্র যথারীতি যেমন হয়ে থাকে। রাঘব রায়ের উপর তারও দারুণ আক্রোশ।

প্যারেরা মীরবহরপুরের একটি মেয়েকে অপমান করেছিল। সেই অপরাধে রাঘব রায় তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে কাছারি বাড়ির থামে বেঁধে চাবুক পেটা করেছিলেন। এত দিন সে অপমানের প্রতিশোধ প্যারেরা নেবার চেষ্টা করে নি। কারণ রাঘব রায়ের বলবিক্রমের কথা তার অজানা ছিল না। সুতরাং ডিমোলোর প্রস্তাবে সে সহজেই রাজী হয়ে গেল।

সিংহেশ্বরের নীলকুঠির সাহেব হাণ্ট জাতিতে ইংরেজ। জাত বেনে। ডিমোলোর সে অনেক দিনের বন্ধু। মীরবহরপুরে সে-ও কিছু জমির চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিল। ঐ অঞ্চলের কিছু জমি, দরকার হলে জোর করে, দখল করার ইচ্ছা তার অনেক দিনের। কিন্তু একলা রাঘব রায়ের সঙ্গে পেরে উঠবে না বুঝে এতকাল চুপ করে ছিল। ডিমোলোর কথায় সে-ও সাগ্রহে রাজী হলো। কিন্তু তার কথা হলো, জমির অর্ধেক সে পাবে ; বাকি অর্ধেক পাবে ডিমোলো ও প্যারেরা।

ডিমোলো সাহেব বললে, "আমরা তিনজন যখন এক হয়েছি, তখন আমার ধারণা, জোর করে আমরা মীরবহরপুরে নীল চাষ করতে পারবো। প্যারেরা কি বল ?"

প্যারেরা একটু চিন্তা করে বললে, "কিন্তু লর্ড ক্যানিং, শুনেছি, এই রকম কাজ দমন করতে চায়।"

হাণ্ট সাহেব ব্যঙ্গ করে বললে, "ক্লিমেন্সী ক্যানিং! ফুঃ! একটা ভণ্ড অকর্মণ্য ব্যক্তি! তাছাড়া নেটিভদের ওপর জুলুম হলে যে কাঁদুনী উঠবে, তা বেশীদূর পোঁছবে না। ওরা বড় জোর ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাবে। এ পরগনার ম্যাজিস্ট্রেট আমার খুব দোস্ত লোক। দেশ থেকে একই জাহাজের বয়লারে কয়লা ঝাড়তে ঝাড়তে এই স্বর্ণগর্দভদের দেশে এসেছিলুম। যদি কোন গোলমাল হয়, তাকে হাত করা যাবে। একবার তাকে নীলকুঠিতে এনে আচ্ছা খানাপিনা দিলেই সব চাপা পড়ে যাবে। আমি আইন-আদালত, এমনকি লর্ড ক্যানিংয়ের কথাও ভাবি না। আমাদের ভাববার বিষয় শুধু রাঘব রায়ের লোকবল আর অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে।"

ডিমোলো বললে, "সে কথা ঠিক। রাঘব রায়ের লোকবল যথেষ্ট। বহু লেঠেল চোয়াড় ঠ্যাঙাড়ে ঢালী ওর অধীনে আছে। তিন-চারটে গাদা বন্দুকও আছে শুনেছি। লোকটা নিজেও যেমন সাংঘাতিক জোয়ান, তেমনি ভীষণ সাহসী।"

হাণ্ট সাহেব গড়গড়া টানতে টানতে বললে, "তা বটে। তবে ওকে ঠাণ্ডা করার দাওয়াইও আমার যথেষ্ট আছে। আমার তিন-তিনটে টোটার বন্দুক। আমার কুঠির লোকজনদেরও এই বন্দুক চালাতে শিখিয়েছি।"

প্যারেরা বললে, "কিন্তু এ দেশের লোকেরা টোটা ছোঁবে না।"

হাণ্ট বললে, "হাঁ, তা শুনেছি। গেল বছর যে সিপাই মিউটিনী হয়েছিল, তার একটা কারণই হলো ওই টোটা। আমি সেজন্যে ভাবি নে। আমার কুঠির বেশীর ভাগ লোকই নেটিভ খ্রীস্টান। তাদের কোন কুসংস্কার নেই। আমাদের গভর্নমেণ্ট যদি প্রথমেই এ দেশের সব লোককে খ্রীস্টান করে ফেলতো, তাহলে এই মিউটিনী কেন, কোন বিদ্রোহের সম্ভাবনাই এ দেশে থাকতো না। যাক সেসব কথা।

আমার লোকেরা আমায় জাত-ভাই ভেবে শেষপর্যন্ত আমার হয়ে দেশের লোকের বিরুদ্ধে লড়বে,—এটা আমি বলতে পারি।"

প্যারেরা জিজ্ঞাসা করলে, "তাহলে এখন আমরা কি করবো?"

হাণ্ট বললে, "আমার মত, রাঘব রায়ের জমিদারীর কোণে যে নতুন ঘরটা আছে, সেটা আমরা তিনজনে মিলে জোর করে দখল করে একটা যৌথ নীলকুঠি পত্তন করবো। রাঘব রায় যদি বাধা দিতে আসে, তাহলে তিনজনে সদলবলে তাকে দমন করবো। কিন্তু আগেই বলেছি, মুনাফার অর্ধেক আমার চাই।"

প্যারেরা বললে, "তাই হবে। আমি কিন্তু রাঘব রায়ের অপমানের প্রতিশোধ নিতে শুধু তার জমি ছিনিয়ে নিয়েই ক্ষান্ত থাকবো না,— আরও কিছু করার মতলব আমার আছে।"

হাণ্ট সাহেব উঠে দাঁড়ালো, বললে, "বিশেষ জরুরী কাজে এখনই আমাকে বেরোতে হবে। এই কথাই তাহলে ঠিক রইল। কাল তোমরা দুজনেই এসো। কালই এ কাজের দিন ও প্রোগ্রাম স্থির করবো।"

কুঠিয়ালদের সভা ভঙ্গ হলো।

রাঘব রায় প্রবল জ্বরবিকারে প্রায় দেড় মাস শয্যাশায়ী ছিলেন। এখন জ্বর নেই, কিন্তু বেশ দুর্বল। বহু দিন অন্দরমহল থেকে তিনি বের হন নি। কিন্তু আজ প্রবীণ দেওয়ান রঘুপতির বার বার অনুরোধে বিকাল বেলায় রোদের তাপ কমে গেলে ধীরে ধীরে বাইরের মহলে বৈঠকখানায় এসে বসেছেন।

মাথার ওপর টানা পাখা চলেছে, তবু একজন বরকন্দাজ একটা আড়-পাখা নিয়ে তাঁকে বাতাস করছে। একজন এসে তাঁর হাতে গড়গড়ার নল তুলে দিলে। এমন সময় দেওয়ান রঘুপতি ও সদর নায়েব শ্রীমন্ত এসে নমস্কার করে দাঁড়ালো।

রঘুপতি ও শ্রীমন্তের চোখেমুখে দারুন উত্তেজনার ভাব। রাঘব

রায় বুঝলেন, জমিদারীতে বিশেষ কোন গোলযোগ ঘটেছে। কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন স্বরে রঘুপতিকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কি খবর বলুন তো? আপনাদের হাবভাব দেখে তো ভাল মনে হচ্ছে না?

দেওয়ান উত্তর দিলেন, "হুজুর, খবর খুবই খারাপ। ডিমোলো সাহেব আরও দুজন কুঠিয়াল সাহেবের সঙ্গে মিলে জমিদারীর বিষম ক্ষতি করবার উদ্যোগ করেছে।"

রাঘব রায় জিজ্ঞাসা করলেন, "ডিমোলো? ওঃ—হ্যাঁ! সেই চড় খাওয়ার প্রতিশোধ বুঝি? কি ক্ষতি তারা করতে চাইছে?"

দেওয়ান বললেন, "সে রাগ তো আছেই। তাছাড়া ওরা জোর করে আমাদের নতুন চর এলাকায় নীলকুঠি তৈরি করেছিল—"

বিস্মিত উত্তেজিত রাঘব রায় দেওয়ানকে বাধা দিয়ে বললেন, "জোর করে নীলকুঠি তৈরি করেছিল? আমার জমিদারীর এলাকায়? কবে?"

দেওয়ান উত্তর দিলেন, "আপনি তখন জ্বরে বেহুঁশ ছিলেন। তাই তখন কিছু আপনাকে জানাই নি।"

রাঘব রায় জিজ্ঞাসা করলেন, "হঠাৎ এত তাড়াতাড়ি একটা নীলকুঠি ওরা তৈরি করলে কি করে?"

দেওয়ান বললেন, "ঐজন্যে ওরা বিদেশ থেকে বহু মিস্ত্রী, কারিগর, লোকজন এনেছিল। তারপর দিনে রাতে কাজ করিয়ে এক হপ্তার মধ্যে একটা পুরো নীলকুঠি তৈরি করেছিল। ও দিকটা চর এলাকা, প্রজার বসতি নেই, জমিদার-সরকারে লোকদের যাতায়াতও কম,—তাই খবর পেতে দেরি হয়েছিল। যাই হোক এক হপ্তা পরে খবর পেয়ে আমি নিজে পাল্কীতে করে গিয়ে দেখি, নতুন চরের ঠিক মাঝখানে দিব্বি একটা কুঠিবাড়ি আর লোকজন। বড় বড় চৌবাচ্চা বা হোজ তৈরী হয়েছে। টানা কলে নদী থেকে হুড় হুড় করে জল উঠছে। নৌকো বোঝাই করে অন্য জায়গা থেকে নীল গাছ আসছে। আর বহু বুনো স্ত্রী-পুরুষ কুলীর কাজ করছে!"

উত্তেজিতভাবে রাঘব রায় বললেন, "সে সময় আমাকে জানালেন না কেন? ম্যাজিস্ট্রেটকে দরখাস্ত করতুম।"

মাথা চুলকুতে চুলকুতে দেওয়ান রঘুপতি উত্তর দিলেন, "হুজুরের কবিরাজ মশাই নিষেধ করলেন, বললেন, এ সময় ঐ খবর আপনাকে জানালে আপনার শরীরের পক্ষে খুব খারাপ হবে।"

রাঘব রায় গম্ভীর ভাবে বললেন, "হুঁঃ! তারপর—?"

দেওয়ান বললেন, "তারপর আমি নিজে গিয়ে ডিমোলো সাহেবের কাছে অভিযোগ করতে, সে আমাকে চাবুক মারে।"

ক্রুদ্ধ রাঘব রায় ছটফট করে উঠলেন, অধীর কণ্ঠে বললেন "চাবুক মেরেছে! চাবুক? আপনাকে?"

দেওয়ান বললেন, "হুঁঃ, তা মেরেছে। তবে তার প্রতিশোধও নিয়েছি। সেই রাত্রেই লোকজন নিয়ে গিয়ে সেই নীলকুঠি পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে এসেছি।"

এতক্ষণ বাদে রাঘব রায়ের মুখে যেন একটু স্বস্তির আভাস দেখা গেল। তিনি মাথা নেড়ে বললেন, "সাবাস্! ঠিক করেছেন!"

দেওয়ান বললেন, "না হুজুর, কাজটা বোধহয় ভালো করি নি। নীলকুঠি পুড়িয়ে দেবার পর ওরা আরও ক্ষেপে গেছে, ভীষণ প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করছে।"

রাঘব রায় জিজ্ঞাসা করলেন, "ভীষণ প্রতিশোধ? কি রকম?"

দেওয়ান বললেন, "তিন কুঠির সাহেবরা মিলে স্থির করেছে, ওরা আমাদের জমিদারীর দক্ষিণ দিকের বাঁধ কেটে ঐ দিককার গ্রামগুলো সব ভাসিয়ে দেবে, আর—"

রঘুপতি একটু থামলেন। রাঘব রায় তাঁর মুখের দিকে চেয়েছিলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, "থামলেন কেন? বলুন—আর কি?"

দেওয়ান মাথা নীচু করে চাপা গলায় জবাব দিলেন, "আরও সংকল্প করেছে, ওরা জমিদার বাড়ি আক্রমণ করে যথাসর্বস্ব লুঠ করবে, মেয়েদের অপমান করবে।"

রাঘব রায় যেন আগুন হয়ে উঠলেন, বললেন, "এ্যাঁ! এত স্পর্ধা! কবে তারা এ কাজ করতে বাসনা করে?"

দেওয়ান উত্তর দিলেন, "আজ রাত্রে ওরা তিন দল একত্র হয়ে কালই এইসব করবে,—এই রকম খবর পেয়েছি।"

রাগে কাঁপতে কাঁপতে রাঘব রায় চিৎকার করে ডাকলেন, "করালী!"

সঙ্গে সঙ্গে একটা লোক এসে রাঘব রায়কে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালো।

লোকটার চেহারা যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। মাথায় বাবরি চুল। গায়ের রং কালো কুচকুচে। গালে গালপাট্টা দাড়ি, চোমরানো গোঁফ। চোখ দুটো ফিকে লাল। হাতে একটা ছোট ছাঁটা মুগুর।

রাঘব রায় তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "শুনেছিস কিছু?"

করালী বললে, "সবই শুনিছি হুজুর, শুধু আপনার হুকুমের অপেক্ষায় আছি।"

জলদগম্ভীর কণ্ঠে রাঘব রায় বললেন, "আমার জমিদারীতে আর তোর হাতে যত লেঠেল ঠ্যাঙ্গাড়ে চোয়াড় সড়কিওলা ঢালী আছে, তাদের ডেকে আজই রাত্রের মধ্যে তৈরী হবি। ভোর হবার আগেই তোরা দক্ষিণের বাঁধের ওপর গিয়ে উঠবি। যদি সাহেবদের দলের কাউকে সপ্তমুখী নদীর এপারে দেখবি তো একেবারে শেষ করে দিবি। আমি হুকুমদার রইলুম।"

দুর্দান্ত লেঠেল ও দাঙ্গাড়ে ভীষণ শক্তিশালী করালী সর্দার এই আদেশেরই অপেক্ষা করছিল। রাঘব রায়ের কথা শেষ হতেই সে উল্লাসের সঙ্গে বললে, "করালী সর্দার বেঁচে থাকতে আপনার কোন ভাবনা নেই, হুজুর।"

আর একবার রাঘব রায়কে প্রণাম করে করালী বুক ফুলিয়ে সদর্পে বেরিয়ে গেল।

রাঘব রায় কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে দেওয়ান রঘুপতিকে বললেন, "আমাকেও কাল ঐ দক্ষিণের বাঁধে যেতে হবে।"

বিস্মিত দেওয়ান বললেন, "আমরা থাকতে হুজুর নিজে কেন যাবেন ? আপনার শরীর তো ভাল নয়।"

রাঘব রায় বললেন, "না, আমাকে যেতেই হবে। ব্যাপারটা সোজা বলে মনে হচ্ছে না। যদি সাহেবরা কোন মতে ওদিককার বাঁধ কাটতে পারে, তাহলে ঐ অঞ্চলের তুখানা চক এক ঘণ্টার মধ্যে নোনা জলে ভেসে যাবে, আমার হাজার হাজার প্রজার সর্বনাশ ঘটবে। যেতেই হবে আমাকে। আমি জানি, আমার প্রজারা আমাকে যেমন ভয় করে, তেমনি ভালবাসে ভক্তিও করে।"

একটু কিন্তু-কিন্তু করে দেওয়ান বললেন, "কিন্তু, হুজুর, সাহেবদের দল যদি ঠিক ঐ সময় জমিদার বাড়ি হানা দেয় ?"

একমুহূর্ত চিন্তা করে রাঘব রায় বললেন, "আমার মনে হয়, অতটা সাহস ওদের হবে না। আর যদি একান্তই হয়, তাহলে ওদের রোখবার ব্যবস্থাও করে যাব। আপনিই এখানে থাকবেন। আপনার সঙ্গে থাকবে জনকতক বাছাইকরা লেঠেল ঢালী ; তাছাড়া বাড়ির পাইক-পেয়াদারা তো আছেই। একটা মুঙ্গেরী বন্দুকও রেখে যাব। আর কুঠিয়াল সাহেবরা আসে তো ঐ পথ দিয়েই আসবে। আসবার পথেই ওদের আমরা আটকে ফেলবো। আমার কথা ভাববেন না। করালী আছে, দেহরক্ষী হিসেবে শ্রীমন্ত আমার সঙ্গে থাকবে।"

রাঘব রায়ের স্বয়ং ঘটনাস্থলে যাওয়াটা দেওয়ানের ঠিক মনঃপূত নয় তুই কারণে। প্রথমত, রাঘব রায়ের শরীর ভাল নয়, সবে কঠিন রোগ থেকে উঠেছেন। দ্বিতীয়ত, তিনি ভীষণ রাগী, রাগলে জ্ঞান থাকে না। জমিদারী রক্ষার ব্যাপারে কয়েকটি দাঙ্গায় এর আগে তিন-চারটে খুন হয়েছে। কিন্তু সে সময় এখন আর নেই। বহু পরিবর্তন হয়েছে দেশে, আইন-আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার উপর এবার বিবাদ হচ্ছে সাহেবদের সঙ্গে, যারা আজ রাজার জাত, যাদের হাতে আজ আইন-আদালত।

দেওয়ান রঘুপতির মাথায় এই সব চিন্তা ঘুরতে থাকে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। কুলবিগ্রহের মন্দিরের সন্ধ্যা-আরতির শাঁখ-ঘন্টা বাজতেই রাঘব রায় উঠে পড়লেন।

সারা মীরবহরপুরে সাজ-সাজ রব পড়ে গেছে—রীতিমত যুদ্ধের ব্যাপার। বিপক্ষে তিন-তিনটে কুঠির সাহেব,—তাদের দলবল অস্ত্রশস্ত্র আছে। তাদের সঙ্গে লড়তে হলে নিজেদের কতটা শক্তিশালী হতে হবে, সে বিষয়ে করালীর ভালরকম জ্ঞান আছে, আর আছে সদর নায়েব শ্রীমন্তের। করালী সর্দার শুধু বিখ্যাত লেঠেল নয়, সে এ অঞ্চলের লেঠেল-ঢালীদের দলপতি। বহু দুর্ধর্ষ ডাকাতও তাকে ভয়-ভক্তি করে, তার ডাকে এসে পাশে দাঁড়ায়, সাহায্য করে।

রাত শেষ হবার অনেক আগেই করালী সদলবলে রীতিমত প্রস্তুত হয়ে দক্ষিণের বাঁধের আশপাশে হেঁতাল জঙ্গলের মধ্যে গোপনে অপেক্ষা করতে থাকে। নীলকুঠির কোন লোক সপ্তমুখী নদীর এপারে এলেই আত্মপ্রকাশ করবে ; বেপরোয়া সড়কি, তারপর লাঠি চালাবে। তাতে যদি না হয়, ছাঁটা মুগুর তলোয়ার ছোরা তো আছেই। হুজুর এলে দুটো বন্দুক থাকবে তাদের দলে।

সবে ভোর হয়েছে।

কুলবিগ্রহদের প্রণাম করে এসে রাঘব রায় স্ত্রী দশভুজা দেবীকে সহজ কণ্ঠে বললেন, "প্রজারা আমাদের সন্তান। তাদের ধনপ্রাণ রক্ষার জন্যে আমি সেখানে যাচ্ছি, আমার জন্যে ভেব না। আমার যা লোক-বল অস্ত্রশস্ত্র আছে, তাতে মনে হয় কুঠিয়াল সাহেবরা পেরে উঠবে না। দেওয়ানজী আশঙ্কা করেন, সাহেবরা আমাদের বাড়ি আক্রমণ করবে। আমার মনে হয়, অতটা সাহস ওদের হবে না। তাছাড়া আমরা দক্ষিণের বাঁধে গিয়ে ওদের এদিকে আসার পথও আটকে ফেলছি। তাহলেও বাড়িতে জনকয়েক ভাল ভাল লেঠেল, একটা বন্দুক ও

দেওয়ানজীকে রেখে যাচ্ছি। দেওয়ানজী সিংহদ্বার ও দেউড়ি আটকে থাকবেন। বাড়ির পাইক-বরকন্দাজরা বাড়ির চারদিক টহল দেবে। এই ব্যবস্থাই আমি করে গেলুম।"

দশভুজা দেবী স্থির হয়ে সব কথা শুনছেন। মেয়ে মহামায়া ও ছেলে দর্পনারায়ণ তখনও পালঙ্কে ঘুমোচ্ছে। রাঘব রায় তাদের দুজনের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আবার বলতে লাগলেন, এবার তাঁর গলার স্বর বিষণ্ন আরও গম্ভীর, "দেখ, একটা কথা বলি—যদিও সাহেবরা আমাদের সঙ্গে পেরে উঠবে বলে মনে হয় না, তবু দাঙ্গা-লড়াইয়ের ব্যাপারে কখন কি ঘটে, অনেক সময় আগে থাকতে ঠিক করে বলা যায় না। যদি—যদি ওখানে আমার তেমন কিছু হয়, তাহলে আমার ঘোড়া উল্কা একলা চলে আসবে। তাকে যদি একলা ফিরে আসতে দেখ, তাহলে তক্ষনি বাড়ির গড়ের খিল খুলে দেবে। বাড়ির চারদিকের খাদ দেখতে দেখতে জলে ভর্তি হয়ে যাবে, বাইরে থেকে কেউ বাড়িতে ঢুকতে পারবে না। চোরা কুঠরির কোণে যে সরু লোহার শিকল আছে, সেটা টানলেই গড়ের খিল খুলে যাবে, আর সেখানে যে কাছিটা আছে, সেটা টানলেই গড়ের খিল বন্ধ হয়ে যাবে। খুব সাবধান, বেশীক্ষণ গড়ের খিল খুলে রেখো না। তাহলে সারা বাড়ি এমন কি নীচের তলা জলে ডুবে যাবে। আব এক কথা—"

রাঘব রায় থামলেন। একটু যেন বিচলিত।

দশভুজা দেবী তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ছিলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, "আর কি?"

রাঘব রায় বললেন, তাঁর গলা একটু কেঁপে উঠলো, "আর—আর কোন মতে সাহেবরা কেউ যদি বাড়ির অন্দরমহলে ঢোকে···তুমি আছ, মেয়ে মহামায়াও বড় হয়েছে, কুলবিগ্রহ আছেন—"

দশভুজা দেবী বুদ্ধিমতী। সাহসী নারী। স্বামী কি বলতে চাইছেন, বুঝে নিয়ে বললেন, "আর বলতে হবে না। এ দেশের কোমলা নারীরাও পশু বা দৈত্য বধের সময় কিরকম ভয়ঙ্করী হতে পারে, তা

পড়েছি। অন্দরমহলের পবিত্রতা রক্ষা করবার জন্যে কি করতে হয়, তা আমার জানা আছে।"

রাঘব রায় মাথা নেড়ে বললেন, "আমি তা জানি। তাই নির্ভাবনায় সেখানে যেতে পারছি।"

রাঘব রায়ের সব চেয়ে প্রিয় ঘোড়াটির নাম 'উল্কা'। উল্কার যেমন বলিষ্ঠ উন্নত দেহ, তেমনি সে তেজী, তার বুদ্ধিও তেমনি প্রখর। রাঘব রায়ের মনের কথা সে যেন ধরতে পারে। গায়ের রং তার দুধের মতো সাদা। তার পিঠে রাঘব রায়কেই মানায়।

ভোর হতেই রাঘব রায় সিংহদ্বারের সামনে উল্কার পিঠে উঠে বসলেন —তাঁর কাঁধে ঝোলানো মুঙ্গেরী বন্দুক, কোমরের খাপে তলোয়ার। উল্কা ছুটে চললো। সঙ্গে চললো শ্রীমন্ত—একটি তেজী ঘোড়ায়।

মীরবহরপুরের জমিদারীর দক্ষিণ সীমানার প্রায় সবটাই সপ্তমুখী নদী এঁকে বেঁকে ঘিরে রেখেছে। অতি ভয়ঙ্কর এই সপ্তমুখী। কাছেই বঙ্গোপসাগর। জোয়ারের সময় নদীতে জল থৈ থৈ করে, উথলে উথলে ওঠে, বড় বড় ঢেউ তীরে গিয়ে আছড়ে পড়ে। ভাঙনের আশঙ্কা থাকে প্রায় সব সময়। সেইজন্যে রাঘব রায় এর উত্তর তীরে খুব উঁচু ও মজবুত বাঁধ বেঁধে দিয়েছেন। তাই রক্ষা পেয়েছে বহু ক্ষেত, বহু পল্লী, হাজার হাজার কৃষকের ধনপ্রাণ। এই বাঁধকে এ অঞ্চলের লোকেরা বলে দক্ষিণের বাঁধ।

সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণের বাঁধে নীল কুঠিয়ালদের সঙ্গে করালী সর্দারের দলের রীতিমত লড়াই আরম্ভ হয়েছে। বাঁধের ওপর রাঘব রায়ের এলাকায় করালীর দল, নদীর ওপারে কুঠিয়ালরা।

কুঠিয়ালদের দশ-বারোখানা ডিঙ্গিবোঝাই লোক-লস্কর লাঠি সড়কি গাঁতি কোদাল নিয়ে নদী পার হয়ে এ পারে আসবার চেষ্টা করছে, আর করালীর দল প্রাণপণে তাদের বাধা দিচ্ছে।

দু পক্ষেই সড়কি চলছে সমানে। সাহেবদের দল নেহাত কম নয়। তার উপর ওদের বন্দুক আছে দুটো।

করালীর দেহ ক্ষতবিক্ষত। তার প্রধান সাকরেদ লোটনকে হাণ্ট সাহেব গুলি করেছে। তার অবস্থা শোচনীয়। হাণ্ট সাহেবের দল একটা বড় বজরা করে তীরের কাছে এসে গেছে। এইবার বুঝি ঘাটে ভিড়বে।

করালীর দল লাফ দিয়ে কোমর জলে পড়ে নৌকোটা ডুবিয়ে দেবার চেষ্টা করলো। হাণ্ট সাহেবের গুলিতে করালীর দলের দুজন আহত হলো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সাহেবদের একটা নৌকো করালীর দল ডুবিয়ে দিলে বটে, কিন্তু পরক্ষণে তাদের অপর একখানা নৌকো তীরে এসে ভিড়লো। এই নৌকোতে স্বয়ং হাণ্ট সাহেব—হাতে বন্দুক। তার সঙ্গে করালীর দল আর পারছে না।

হাণ্টের দ্বিতীয় দল কোদাল গাঁতি নিয়ে মহোল্লাসে বাঁধে ওঠবার উপক্রম করছে, এমন সময় চারদিকে ভীষণ সোরগোল উঠলো—রাঘব রায়! রাঘব রায়! রাঘব রায় নিজে এসেছেন!

ক্ষণেকের জন্যে সবাই বুঝি থমকে দাঁড়ালো। সেই দুর্দান্ত রাঘব রায়, যে রাজার জাতকে চড় মেরে অজ্ঞান করে দেয়! চাবুক মেরে যে সাহেবের দেহ রক্তাক্ত করে, যার ভয়ে সুন্দরবনের বাঘরা পর্যন্ত নদীর এপারে আসে না, সেই রাঘব রায় নিজে এসেছেন? নিজে—?

"খবরদার!"

দু পক্ষের দলই কেঁপে উঠলো—সপ্তমুখী নদীর তীরে বাঁধের ওপর কে যেন কামান দাগলে।

রাঘব রায় আবার গর্জন করে উঠলেন, "খবরদার! কুঠিয়ালদের কেউ আমার এলাকার মাটিতে পা দিয়েছে কি পুঁতে ফেলবো।"

পলকের মধ্যে দৃশ্য পাল্‌টে গেল। সাহেবদের পক্ষের দেশী খৃস্টান আর ভাড়াকরা লোকজন প্রাণভয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লো। তারা জানে, নদী বড় বড় কুমীরে ভরতি। তবু সাঁতার কেটে তারা নদীর

ওপারে যাবার চেষ্টা করতে থাকে। কুমীরের গ্রাস থেকে তবু রক্ষা পাওয়া সম্ভব, কিন্তু রাঘব রায়?—সাক্ষাৎ যম! হাণ্ট সাহেব বন্দুক উঁচিয়ে নিজের লোকদের আটকাবার চেষ্টা করলে। কিন্তু ফল হয় না। রাঘব রায়ের জমিতে পা দেবার সাহস দলের কারো নেই। তারা তখন প্রাণপণে সাঁতার কাটছে। একজনকে ইতিমধ্যে কুমীরে ল্যাজের ঝাপটা মেরে শেষ করে দিয়েছে, আর একজনকে টেনে নিয়ে গেছে। তবুও তারা ফিরছে না। মাঝ নদীতে নৌকোর উপর দাঁড়িয়ে হাণ্ট সাহেব ব্যর্থ আক্রোশে রাগে অপমানে জ্বলতে লাগলো। তার নৌকোর দাঁড়ি-মাঝিরাও পালিয়ে গেছে রাঘব রায়ের হুঙ্কার শুনে।

নৌকো টলছে, হাণ্টও টলছে। রাঘব রায়কে লক্ষ্য করে হাণ্ট বন্দুকের ট্রিগার টিপলে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে কোথা থেকে এক সড়কি এসে তার কাঁধ ভেদ করলে। হাণ্ট নদীব জলে পড়ে গেল।

সড়কিটা ছেড়েছিল শ্রীমন্ত। হাণ্টের নৌকোটা তখন নদীর ঢেউতে সরে সরে যাচ্ছিল, দুলছিল অত্যন্ত। তাই হাণ্টের ঠিক মাথায় সড়কিটা বেঁধে নি। তা না হলে শ্রীমন্তের তাক কখনো একচুলও এদিক-ওদিক হয় না।

হাণ্ট নদীতে পড়ে সাহায্যের জন্যে চিৎকার করে উঠলো। কিন্তু কে সেদিকে এগিয়ে আসবে? স্বয়ং রাঘব রায় বাঁধ থেকে তীরে এসে নেমেছেন।

হাণ্টের কুঠির দেওয়ানকেও দেখা গেল না। কোনমতে সাঁতার কেটে হাণ্ট ওপারের দিকে এগিয়ে চললো। তার পরে তার বা তার দলের খবর কেউ জানে না।

হাণ্টের গুলি রাঘব রায়ের দেহে না লেগে লেগেছিল তাঁর প্রিয় ঘোড়া উল্কার মুখে। উল্কা যন্ত্রণায় পাগলের মতো লাফাতে শুরু করলে। রাঘব রায় বহু চেষ্টা করেও তাকে বাগে আনতে পারলেন না। শেষে রেকাব থেকে পা খুলে তিনি মাটিতে লাফিয়ে পড়লেন। উল্কা বেপরোয়া ছুটতে ছুটতে হেঁতাল জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে কোথা থেকে এক সড়কি এসে
তার কাঁধ ভেদ করলে। হাণ্ট নদীর জলে পড়ে গেল। —পৃঃ ৬০

তার দিকে নজর দেবার অবসর রাঘব রায়ের তখন ছিল না। তিনি দেখলেন, কিছু দূরে একটা গেও গাছের আড়ালে ডিমোলো আর ফকরে মার্টিন জন কয়েক লোক নিয়ে বাঁধ কাটবার উপক্রম করছে, করালী ছুটে যাচ্ছে সেদিকে। সঙ্গে তার প্রিয় সাকরেদ ভোটন। রাঘব রায় শ্রীমন্তকে সঙ্গে নিয়ে সেই দিকে ছুটে গেলেন।

ডিমোলো করালীকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লে। গুলি লাগলো ভোটনের কাঁধে। সে যন্ত্রণায় শুয়ে পড়লো। এ দৃশ্যে রাঘব রায় আর স্থির থাকতে পারলেন না। বন্দুকটা শ্রীমন্তের হাতে দিয়ে খাপ থেকে তলোয়ার খুলে তিনি ডিমোলো ও ফকরে মার্টিনের দিকে ছুটে গেলেন।

ডিমোলোর বন্দুকে টোটা ছিল না। তাড়াতাড়ি বন্দুক খুলে সে টোটা পুরবার উপক্রম করতেই করালী তার মাথায় প্রাণপণ শক্তিতে ছাঁটা মুগুর বসিয়ে দিলে। ডিমোলো চিত হয়ে পড়লো। পরক্ষণে করালীর ছোরা আমূল বিঁধে গেল ফকরের পিঠে। যন্ত্রণায় বিকট চিৎকার করে ফকরে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। রাঘব রায়ের তলোয়ারের আঘাতটা যে কত সাংঘাতিক, তা উপলব্ধি করবার আগেই সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে। কুঠিয়ালদের দলের শেষ যে ক জন অবশিষ্ট ছিল, তারা ইতিমধ্যে প্রাণভয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। নদীর এপারে ওদের কাউকেই আর দেখা গেল না।

লড়াই শান্ত হলে, করালী রাঘব রায়ের কাছে এসে শান্ত কণ্ঠে বললে, "হুজুর, প্যারেরাকে তো দেখছি নে। সে কোথায় ?"

রাঘব রায়ের খেয়াল হলো। চিন্তিত কণ্ঠে বললেন, "তাই তো! কোথাও লুকিয়ে নেই তো ?"

শ্রীমন্তকে বিচলিত মনে হলো। বললে, "ব্যাপারটা কিন্তু খুবই সন্দেহজনক মনে হচ্ছে। সে এই সুযোগে অন্য কোন পথ দিয়ে মীরবহরপুরে যায় নি তো ?"

বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন রাঘব রায়, বললেন, "তা হতে পারে—

খুবই সম্ভব। আমি আর দেরি করবো না। এক্ষনি বাড়ি যাওয়া দরকার। এদিককার অবস্থা তো ঠাণ্ডা। কিন্তু উল্কা কোথায় গেল? উল্কা?"

একজন লেঠেল বললে, "হুজুরের ঘোড়াকে মাঠময় পাগলের মতো ছুটাছুটি করতে দেখেছি। তারপর যে কোন্ দিকে গেছে, বলতে পারি নে।"

অস্থির কণ্ঠে রাঘব রায় বললেন, "সর্বনাশ! উল্কা যদি বাড়ি ফিরে থাকে! ছিপ নৌকোয় এক্ষনি আমি বাড়ি ফিরবো। একাই যাবো। শ্রীমন্ত, তুমি আরো কিছুক্ষণ এখানে থেকে অবস্থা ভাল বুঝলে চলে যেও। করালী আজ এখানে থাক্। আমার বন্দুকও রইল। দু পক্ষের লাশগুলো গুম করবে।"

রাঘব রায় একটি ছিপে উঠে পড়লেন।

... ...

মীরবহরপুরের জমিদার বাড়ি রাজপ্রাসাদ বললেই হয়। বিরাট মহল। চারদিককার বাগান পুকুর সবই উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। পাঁচিলের পর গভীর খাদ বা গড়। খাদের সঙ্গে নদীর যোগাযোগ করা যায়। গড়ের খিল খুলে দিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নদীর জলে গড় ভরে যেতে পারে—বিশেষত জোয়ারের সময়। তখন এই বাড়িতে যাতায়াতের একমাত্র পথ থাকে সিংহদ্বার দিয়ে। সিংহদ্বার ও দেউড়িতে জমিদার বাড়ির সান্ত্রীরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দিনরাত পাহারা দেয়।

জমিদার বাড়ির গড় ছাড়িয়ে একটু দূরে প্রায় নদীর ধারে জমিদারদের হাতীশালা, পিলখানা, গোয়ালঘর। তারপর পাতাল-শিবের ভাঙা মন্দির। নদীর পাড়ে কয়েক ঘর জেলে-মালোদের বাসও আছে।

রাঘব রায়ের দেওয়ান রঘুপতি বয়সে প্রৌঢ় হলেও বেশ শক্তিশালী ও সাহসী। এ বয়সে এখনো বন্দুক ছুঁড়তে সড়কি চালাতে ক্লান্তি

বোধ করেন না। তখনকার দিনে জমিদারীর কর্মচারীদের এসব বিষয়ে দক্ষতা না থাকলে চলতো না।

রাঘব রায়ের ব্যবস্থা মতো জমিদার বাড়ির রক্ষীরা ঢাল সড়কি তলোয়ার নিয়ে দেউড়িতে পাহারা দিচ্ছে।

দেওয়ান রঘুপতি একটা বন্দুক নিয়ে উঁচু নহবতখানায় দাঁড়িয়ে ফাঁকা মাঠ ও নদীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছেন। কিন্তু বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর হতে চললো,—সাহেবদের কাউকেই দেখা যায় না, কর্তার কাছ থেকেও কোন লোক ফিরে এল না।

কুঠিয়াল প্যারেরা সাহেব যেমন শয়তান তেমনি ধূর্ত। তার ধারণা, জমিদার রাঘব রায়ের আজ সদলবলে বাঁধ রক্ষা করতে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী। যদি যায় তো, জমিদার বাড়িতে বেশী লোক থাকবে না। আর সেই সুযোগে সে জমিদার বাড়ি আক্রমণ করবে। সেইজন্যে সে খুব ভোরেই নিজের দলবল নিয়ে একটা বজরায় করে নদীর ধারে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে তার একজন দেশী অনুচর এসে খবর দিলে, জমিদার বাড়ি আক্রমণ করার সুবিধা নেই। সেখানে দেউড়িতে পাইক লেঠেল বহু। বরকন্দাজরা বাড়ির চারদিকে টহল দিচ্ছে। বাড়ির তিন দিকে গড়। সামনের দিকে দেওয়ান রঘুপতি স্বয়ং বন্দুক নিয়ে পাহারা দিচ্ছে।

সব শুনে প্যারেরা কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললে, "জমিদার বাড়ির রক্ষীদের দেউড়ি থেকে সরাতেই হবে।"

মনে মনে সে মতলব ভাজতে থাকে।

বেলা ঠিক দ্বিপ্রহর। দেওয়ান রঘুপতি হঠাৎ জমিদার বাড়ির দক্ষিণ মহলের ছাদের উপর থেকে দেখলেন, হাতীশালা পিলখানা গোশালা থেকে আরম্ভ করে নদীর ধারের জেলেদের কুড়েগুলোতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো। বুড়ো হাতীটা, বিশ-পঁচিশটা ঘোড়া,

খুবই সম্ভব। আমি আর দেরি করবো না। এক্ষনি বাড়ি যাওয়া দরকার। এদিককার অবস্থা তো ঠাণ্ডা। কিন্তু উল্কা কোথায় গেল ? উল্কা ?"

একজন লেঠেল বললে, "হুজুরের ঘোড়াকে মাঠময় পাগলের মতো ছুটাছুটি করতে দেখেছি। তারপর যে কোন্ দিকে গেছে, বলতে পারি নে।"

অস্থির কণ্ঠে রাঘব রায় বললেন, "সর্বনাশ ! উল্কা যদি বাড়ি ফিরে থাকে ! ছিপ নৌকোয় এক্ষনি আমি বাড়ি ফিরবো। একাই যাবো। শ্রীমন্ত, তুমি আরো কিছুক্ষণ এখানে থেকে অবস্থা ভাল বুঝলে চলে যেও। করালী আজ এখানে থাক্। আমার বন্দুকও রইল। দু পক্ষের লাশগুলো গুম করবে।"

রাঘব রায় একটি ছিপে উঠে পড়লেন।

... ...

মীরবহরপুরের জমিদার বাড়ি রাজপ্রাসাদ বললেই হয়। বিরাট মহল। চারদিককার বাগান পুকুর সবই উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। পাঁচিলের পর গভীর খাদ বা গড়। খাদের সঙ্গে নদীর যোগাযোগ করা যায়। গড়ের খিল খুলে দিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নদীর জলে গড় ভরে যেতে পারে—বিশেষত জোয়ারের সময়। তখন এই বাড়িতে যাতায়াতের একমাত্র পথ থাকে সিংহদ্বার দিয়ে। সিংহদ্বার ও দেউড়িতে জমিদার বাড়ির সান্ত্রীরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দিনরাত পাহারা দেয়।

জমিদার বাড়ির গড় ছাড়িয়ে একটু দূরে প্রায় নদীর ধারে জমিদারদের হাতীশালা, পিলখানা, গোয়ালঘর। তারপর পাতাল-শিবের ভাঙা মন্দির। নদীর পাড়ে কয়েক ঘর জেলে-মালোদের বাসও আছে।

রাঘব রায়ের দেওয়ান রঘুপতি বয়সে প্রৌঢ় হলেও বেশ শক্তিশালী ও সাহসী। এ বয়সে এখনো বন্দুক ছুঁড়তে সড়কি চালাতে ক্লান্তি

বোধ করেন না। তখনকার দিনে জমিদারীর কর্মচারীদের এসব বিষয়ে দক্ষতা না থাকলে চলতো না।

রাঘব রায়ের ব্যবস্থা মতো জমিদার বাড়ির রক্ষীরা ঢাল সড়কি তলোয়ার নিয়ে দেউড়িতে পাহারা দিচ্ছে।

দেওয়ান রঘুপতি একটা বন্দুক নিয়ে উঁচু নহবতখানায় দাঁড়িয়ে ফাঁকা মাঠ ও নদীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছেন। কিন্তু বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর হতে চললো,—সাহেবদের কাউকেই দেখা যায় না, কর্তার কাছ থেকেও কোন লোক ফিরে এল না।

কুঠিয়াল প্যারেরা সাহেব যেমন শয়তান তেমনি ধূর্ত। তার ধারণা, জমিদার রাঘব রায়ের আজ সদলবলে বাঁধ রক্ষা করতে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী। যদি যায় তো, জমিদার বাড়িতে বেশী লোক থাকবে না। আর সেই সুযোগে সে জমিদার বাড়ি আক্রমণ করবে। সেইজন্যে সে খুব ভোরেই নিজের দলবল নিয়ে একটা বজরায় করে নদীর ধারে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে তার একজন দেশী অনুচর এসে খবর দিলে, জমিদার বাড়ি আক্রমণ করার সুবিধা নেই। সেখানে দেউড়িতে পাইক লেঠেল বহু। বরকন্দাজরা বাড়ির চারদিকে টহল দিচ্ছে। বাড়ির তিন দিকে গড়। সামনের দিকে দেওয়ান রঘুপতি স্বয়ং বন্দুক নিয়ে পাহারা দিচ্ছে।

সব শুনে প্যারেরা কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললে, "জমিদার বাড়ির রক্ষীদের দেউড়ি থেকে সরাতেই হবে।"

মনে মনে সে মতলব ভাজতে থাকে।

বেলা ঠিক দ্বিপ্রহর। দেওয়ান রঘুপতি হঠাৎ জমিদার বাড়ির দক্ষিণ মহলের ছাদের উপর থেকে দেখলেন, হাতীশালা পিলখানা গোশালা থেকে আরম্ভ করে নদীর ধারের জেলেদের কুড়েগুলোতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো। বুড়ো হাতীটা, বিশ-পঁচিশটা ঘোড়া,

শখানেক গরু আর জেলে পরিবারের লোকজন সবাই আর্তনাদ করছে।

দেওয়ান অধীর হয়ে উঠলেন। কিন্তু কি করবেন? আগুন নেভানোর জন্যে জমিদার বাড়ির রক্ষীদের সেখানে পাঠানো উচিত হবে না। সেই সুযোগে সাহেবরা যদি কেউ আসে বা আক্রমণ করে! তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। আগুন জ্বলতে লাগলো। আগুনের লেলিহান শিখা সব কিছু গ্রাস করছে। হাতী ঘোড়া গরু ও জেলেদের করুণ আর্তনাদে মীরবহরপুরের আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

অন্দরমহলে দশভুজা দেবীর কানেও সে আর্তস্বর পৌঁছলো। তিনি দেওয়ানজীকে বলে পাঠালেন, জমিদার বাড়ির রক্ষীদের ঐ আগুন নেভানোর জন্যে পাঠিয়ে দিতে।

রঘুপতি রানীমার আদেশ পালন করলেন বটে, কিন্তু নিজে সেখানে গেলেন না। জনকতক লেঠেলকেও দেউড়িতে রেখে দিলেন।

বেশীর ভাগ রক্ষীদের আগুন নেভানোর জন্যে পাঠিয়ে দিয়ে দেওয়ান রঘুপতি আবার কাছারি বাড়ির ছাদে উঠে এলেন। পরক্ষণে, বাইরের দিকে লক্ষ্য করার জন্যে তিনি গলা বাড়াতেই, হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ হলো। দেওয়ানজীর নিষ্প্রাণ দেহ ছাদের উপর লুটিয়ে পড়লো। বন্দুকের একটা গুলি এসে তাঁর মাথা ভেদ করেছে।

আবার গুলির শব্দ হলো—একবার নয়, পরপর বহুবার। প্যারেরার দল জমিদার বাড়ি আক্রমণ করেছে। তারা সিংহদ্বার পার হয়ে দেউড়িতে ঢুকছে। দেউড়ির রক্ষীরা প্রাণপণে সড়কি তলোয়ার চালাচ্ছে। কিন্তু তারা সংখ্যায় কম। বন্দুকও মাত্র একটা, তাও গাদা বন্দুক। প্যারেরার দলে বন্দুক দুটো। তাদের সঙ্গে জমিদার বাড়ির রক্ষীরা পেরে উঠছে না। দেওয়ানজীর দেখা নেই, তবু তারা লড়ছে। কিন্তু কতক্ষণ!

প্যারেরা আর তার একজন সঙ্গী যখন অন্দরমহলে ঢুকলো, তখন জমিদার বাড়ির চাকর বরকন্দাজ একজনও জীবিত নেই।

দশভুজা দেবী সবই স্থিরভাবে দেখছিলেন। তিনি দ্রুত দোতলার ঘরে গিয়ে রুগ্ন দর্পনারায়ণকে পালঙ্কের নীচে গোপনে শুইয়ে দিয়ে অস্ত্রঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে মেয়ে মহামায়া। নীচের বারান্দা থেকে প্যারেরার উল্লাসধ্বনি কানে এল। সে যেন রাজ্য জয় করেছে।

দশভুজা দেবী মহামায়াকে উপরে থাকতে বলে, নিজে সিঁড়ি দিয়ে একতলায় আসতেই বারান্দার ওপর প্যারেরাব সঙ্গে একেবারে চোখাচোখি। প্যারেরা সেই দিকেই আসছে। সিঁড়ি দিয়ে ওপরের ঘরে যাওয়াই তার মতলব। তার হাতে বন্দুক, তার সঙ্গীর হাতে ছোরা।

দশভুজা দেবী প্যারেরাকে দেখে নড়লেন না। সিঁড়ির পথ আটকে নিষ্পলক চোখে প্যারেরার দিকে চেয়ে রইলেন। নিষ্কম্প নির্ভীক দৃষ্টি।

তাঁর পরনে চওড়া লালপাড় গরদের শাড়ী। আঁট করে পরা। গায়ের রং কাঁচা সোনার মতো। অটুট স্বাস্থ্য। বলিষ্ঠ উন্নত দেহ। মাথায় কাপড় নেই। কোঁকড়ানো চুল সারা পিঠে ছড়িয়ে পড়েছে। সিঁথিতে সিঁদুর, কপালে সিন্দুরের ফোঁটা। সর্বাঙ্গে সোনার গয়না,—হার চুড়ি ঝলমল্‌ করছে। দশভুজা দেবীকে আজ চণ্ডিকা দেবীর মতো দেখাচ্ছে। তাঁর দু চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে।

প্যারেরা থমকে দাঁড়িয়েছে, তাঁর দিকে চেয়ে আছে এক দৃষ্টে। দশভুজা দেবী তবুও অচঞ্চল। স্থির নেত্রে তিনিও তাকিয়ে রইলেন প্যারেরার দিকে। সিঁড়ির পথ ছাড়লেন না।

সাহেব কি ভেবে তার সঙ্গীকে বাইরে যেতে বলে দশভুজা দেবীর দিকে এগিয়ে গেল।

দশভুজা দেবী তবুও স্থির নিশ্চল নিথর—যেন পাথর প্রতিমা। তাঁর পিছনে মহামায়া এসে কখন দাঁড়িয়েছে।

আরও—আরও এগিয়ে এল প্যারেরা···আরও···একেবারে কাছে—

"মাই ঘড্‌ !!"

প্যারেরা বিকট আর্তনাদ করে বারান্দায় লুটিয়ে পড়লো। দশভুজা দেবীর হাতে আঁচলের আড়ালে যে ভীষণ তীক্ষ্ণ খাঁড়া ছিল, প্যারেরা তা বুঝতেই পারে নি। তাছাড়াও এদেশের শান্তশিষ্ট অবলা মেয়েরাও যে আত্মরক্ষার জন্যে দুর্বৃত্ত নিধনে নামতে পারে, তা জলদস্যুদের এই বংশধরটির জানা ছিল না।

এই বীভৎস দৃশ্যে মহামায়া কেঁদে উঠলো। দশভুজা দেবী হাঁপাচ্ছেন।

হঠাৎ দেউড়িতে কিসের যেন শব্দ! দশভুজা দেবী রক্তাক্ত খাঁড়াটা আবার তুলে নিয়ে দেউড়ির সামনে যেতেই দেখলেন—উল্কা!

উল্কা? স্বামীর প্রিয় ঘোড়া উল্কা দেউড়িতে একলা ফিরে এসেছে! জীবনে এই প্রথম উল্কা শুয়ে পড়লো। তারপর সব শেষ। দশভুজা দেবী আর্তনাদ করে উঠলেন, "উল্কা! একলা ফিরে এসেছে! একলা! ওঃ! তাহলে তিনি আর নেই।"

ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মহামায়া বললে, "তাহলে আমাদের কি হবে মা? কে আমাদের রক্ষা করবে, যদি আবার সাহেবরা আসে?"

দশভুজা দেবীর চোখে জল নেই। হাত-পা কাঁপছে থরথর করে। তিনি বললেন, "তুমি ওপরে যাও মা। দাসীদের কাউকে দেখছি নে। তুমি তোমার ভায়ের কাছে গিয়ে বস। সাহেবরা যদি আবার আসে তো আমি এইখান থেকে আটকাবো। যতক্ষণ পারি তোমাদের রক্ষা করবো। আমি গড়ের খিল খুলে দিচ্ছি।"

মহামায়া কিন্তু মাকে ছেড়ে গেল না। দশভুজা দেবী শিকল টেনে গড়ের খিল খুলে দিলেন।

জমিদার বাড়ির চারদিকের গড় দেখতে দেখতে জলে ভরে গেল।

হঠাৎ দূর থেকে আবার শব্দ কানে এল। হল্লা হচ্ছে। কারা যেন আসছে। নদীর ঘাটে কারা যেন কথা কইছে। তারা হয়তো সিংহদ্বারও পার হলো। দশভুজা দেবী মহামায়াকে বললেন, "সাহেবদের অন্য দল বোধহয় আসছে। আর রক্ষা নেই, তুমি ওপরে যাও।"

প্যারেরা বিকট আর্তনাদ করে বারান্দায়
লুটিয়ে পড়লো। দশভুজা দেবীর হাতে আঁচলের··· । —পৃঃ ৬৬

মহামায়া কিন্তু কিছুতেই মাকে একলা রেখে ওপরে যেতে রাজী হলো না।

বাইরের হল্লা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

দশভুজা দেবী মহামায়াকে বললেন, "আমাকে ছেড়ে যখন যাবে না, তখন এস তুজনের একই গতি হোক।"

কাপড়ের ভিতর থেকে তিনি, একটা ছোট কৌটা বের করলেন, মহামায়াকে বললেন, "এটা খাওয়ার পর সাহেবরা কেন, তুনিয়ার কেউই আর আমাদের স্পর্শ করতে পারবে না।"

গড়ে জল বাড়ছে হু হু করে। গড় ভর্তি হয়ে জল আরও বাড়লো। নদীতে এখন জোয়ার। জমিদার বাড়ির মধ্যে সর্বত্র জলে জলময়। একতলার বারান্দার উপরও প্রায় এক হাঁটু জল থৈ থৈ করছে। গড়ের খিল কে বন্ধ করবে?

দশভুজা দেবী ও মহামায়ার দেহে তখন কালকূট বিষের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। তুজনেরই অচৈতন্য দেহ লুটিয়ে পড়েছে জলের উপর।

হঠাৎ পাগলেব মতো সেখানে এসে ঢুকলেন রাঘব রায়। কিন্তু তখন সব শেষ হয়ে গেছে। দেউড়ীর রক্ষীদল, দেওয়ান রঘুপতি, উল্কা, দশভুজা দেবী, মহামায়া, কেউই জীবিত নেই। আছে শুধু রুগ্ন বালক দর্পনারায়ণ। তারও জীবন-দীপ অতি স্তিমিতভাবে জ্বলছে, যে কোন মুহূর্তে নিভে যেতে পারে।

রাঘব রায় কাঁপতে কাঁপতে দশভুজা দেবী ও মহামায়ার দেহের পাশে বসে পড়লেন। গড়ের খিল বন্ধ করা বা রুগ্ন দর্পনারায়ণের কথা তাঁর মনে হলো না।

জল বাড়ছে—ধীরে ধীরে নয়, প্রবল বেগে। মৃত দেহগুলি জলের স্রোতে ডুবছে ভাসছে। রাঘব রায় দশভুজা দেবী ও মহামায়ার দেহের দিকে চেয়ে স্থিরভাবে বসে আছেন। তাঁর বুক পর্যন্ত জল।

যেন বাহ্যজ্ঞান লোপ পেয়েছে। প্রাণ নেই, চেতনা নেই, যেন বিরাট এক পাথরের মূর্তি।

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে শ্রীমন্ত এসে উপস্থিত হলো। অবস্থা দেখে সে ডুকরে কেঁদে উঠলো, "এ সর্বনাশ কি করে হলো?"

রাঘব রায়ের চোখে জল নেই এক ফোঁটা। স্থির অচঞ্চল কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "সবই বিধির বিধান! মীববহরপুরের রায়বংশের সব গেছে, সবাইও গেছে। আছি শুধু আমি আর রুগ্ন দর্পনারায়ণ। যাক —তুমি আসবে জানতাম, তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি। এখন শোন, সাহেবদের যখন হত্যা করা হয়েছে, তখন আমাদের কারোও নিস্তার নেই। ওরা রাজার জাত। আইন দণ্ড অস্ত্র, সবই ওদের হাতে। আমার জীবনের প্রয়োজন শেষ হয়েছে। স্ত্রী ও কন্যা যে পথে গেছে, সেই পথে যাবার জন্যে আমিও এখন প্রস্তুত। কিন্তু আমাদের এই প্রাচীন বংশ যাতে রক্ষা হয়, সেইটা আমার শেষ ও একান্ত ইচ্ছা। তোমার কাছেও আমার শেষ অনুরোধ সেইজন্যেই।"

একটু যেন দম নিয়ে রাঘব রায় আবার শুরু করলেন, "ওপরের ঘরে দর্পনারায়ণ আছে, তুমি তাকে নিয়ে এক্ষনি বাড়ির পিছন দিকের সুড়ঙ্গ দিয়ে বের হয়ে যেখানে হোক পালিয়ে যাও। খিড়কির ঘাটে একটা ছিপ নৌকো আছে, তাতে করেই যাও। রাত শেষ হবার আগে যে লোকালয় পাবে, সেইখানে গিয়ে উঠবে। কেউ যেন তোমাদের পরিচয় জানতে না পারে। তাহলে সাহেবরা তোমাদের রেহাই দেবে না—হয় গুলি করবে, না হয় ফাঁসিতে লটকাবে। ভগবানের কৃপা থাকে তো, তোমার সাহায্যে দর্পনারায়ণের মারফত আমাদের প্রাচীন বংশ রক্ষা হবে। সব ভারই তোমাকে দিচ্ছি শ্রীমন্ত।"

শ্রীমন্ত কেঁদে বললে, "আপনিও চলুন, যারা গেছে, তারা তো আর ফিরবে না—।"

বাধা দিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে রাঘব রায় বললেন, "না। আমার স্ত্রী, আমার কন্যা, আমার মীরবহরপুর, আমার প্রজাদের ছেড়ে কোথাও যাব না,

শ্রীমন্ত। আমার ভুলেই সব গেছে। আমার ভুলেই এই সব হয়েছে, —আমি আর বাঁচতে চাই না। আমার শেষ অনুরোধ রাখ, ভাই।"

শ্রীমন্ত কাঁদছে। রাঘব রায় বললেন, "কাঁদছ কেন শ্রীমন্ত? যা বলি, তাই করো। আর দেরি করো না। জল বাড়ছে, এর পর অন্দর-মহল থেকে বের হতে পারবে না। সুড়ঙ্গের পথও জলে ভরে যাবে। মালখানার সিন্দুকে মোহর আছে, সেগুলি সঙ্গে নিও।"

কাঁদতে কাঁদতে শ্রীমন্ত ওপরের ঘরে চলে গেল।

জল আরো বেড়েছে। ঢেউ খেলছে। দশভুজা দেবী ও মহামায়ার দেহ অল্প অল্প দেখা যায়। রাঘব রায়ের গলা পর্যন্ত ডুবে গেছে। নিথর নিশ্চল তিনি। পাথরের মূর্তির মতো স্ত্রী-কন্যার দিকে চেয়ে বসে আছেন।

জল জল জল—সর্বত্র জল। জল সব গ্রাস করছে। ধীরে ধীরে রাঘব রায়ের দেহও গ্রাস করলো।

ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে এলো। অমানিশার গাঢ় অন্ধকার।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ডায়মণ্ড হারবার রোড।

আলিপুরের পশ্চিমে মোমিনপুর। মোমিনপুর হয়ে ডায়মণ্ডহারবার রোড বেহালা পেরিয়ে দক্ষিণ দিকে চলে গেছে। মাইলের পর মাইল বড়লোকের বাগানবাড়ি বড় বড় মাঠ ছোট ছোট পল্লীগ্রাম পিছনে ফেলে, ডায়মণ্ড হারবারে গিয়ে শেষ হয়েছে। সেইখান থেকে কিছু দূরে উত্তর-পশ্চিমে দশঙ্করা গ্রাম।

দশঙ্করা গ্রামে বহু লোকের বাস।

বুলেট ও বজ্র যখন দশঙ্করার জমিদারদের পুরনো ও পরিত্যক্ত বিরাট বাড়িটার সামনে এসে সাইকেল থেকে নামলো, তখন বেলা প্রায় বারটা।

জমিদারবাড়ির সামনে একটা মাঠ। তারপর সরু রাস্তা। রাস্তার পর বিরাট পুকুর। পুকুরের পাড়ে একটা শিব মন্দির। বুলেট ও বজ্র সাইকেল দুটো মাঠের উপর কাত করে রেখে শিবমন্দিরের দাওয়ায় গিয়ে বসলো।

একটু পরে বুলেট বললে, "এই হলো বীরেনদাদের আদি বাড়ি।"

বজ্র জবাব দিলে, "তাতো বুঝলুম, কিন্তু বাড়িটা দেখে মনে হয়, বহু দিন পরিতক্ত অবস্থায় আছে।"

বাড়িটার দিকে চোখ রেখে বুলেট বললে, "বাড়ির সদর দরজা ছাড়া ওপর-নীচের সব দরজা-জানালা বন্ধ। বাড়ির দেওয়ালে শেওলা পড়েছে। বালি-কাজ খসে গিয়েছে বহু জায়গায়। গত ত্রিশ-চল্লিশ বছর এ বাড়িতে কেউ বাস করেছে বলে মনে হয় না।"

বজ্র বললে, "তার মানে বীরেনদার ঘটনার সঙ্গে এখানকার কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। যদি বীরেনদার এখানে যাওয়া-আসা থাকতো বা তাঁর কোন জ্ঞাতি বা শরিক এখানে থাকতো, তাহলে না হয় বুঝতুম—"

বুলেট তাকে ইশারা করে থামিয়ে দিলে। একটা লোক ঘাটের দিকে আসছে।

লোকটা আরও কাছে আসতে বুলেট জমিদারবাড়িটা হাত দিয়ে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা, এই বাড়িটা এখানকার জমিদার রায়বাবুদের নয়?"

লোকটা ওদের দুজনকে ভাল করে দেখে নিয়ে বললে, "হাঁ, জমিদারবাবুদের বাড়ি বটে, তবে বাবুরা কেউ এখানে থাকেন না। আপনারা কোথা থেকে আসছেন?"

বুলেট বললে, "আসছি একটু দূর থেকে। আর কেউ থাকেন এখানে?"

লোকটি বললে, "তা থাকেন। আপনাদের কিছু দরকার থাকে তো বাবুদের নায়েব শ্রীচরণবাবুর সঙ্গে কথা কইতে পারেন। তিনি বাবুদের জমিদারী ভিটা-ভদ্রাসন কুলবিগ্রহের সেবা, সবই দেখাশুনা করেন।"

বুলেট জিজ্ঞাসা করলে, "তিনি এই বাড়িতেই থাকেন তো?"

লোকটি বললে, "না। তিনি নিজের বাড়িতেই থাকেন। এখান থেকে খুব কাছেই তাঁর বাড়ি। কিন্তু তিনি তো আজ কদিন বাড়িতে নেই, বাবুদের সুন্দরবনমহলে গেছেন। তাঁর ভাই মাধব

গুরুমশাই আছেন, তিনিও বাবুদের কিছু কিছু কাজ করেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারেন। আপনাদের কি দরকার ?”

বুলেট বললে, “আমরা এই দিকে কিছু জমি কিনতে চাই। একটা বড় বাগান করবাব ইচ্ছা আছে। শুনলুম, জমিদারবাবুদের অনেক জমি পড়ে আছে, হয়তো বিক্রি হতে পারে।”

লোকটা বললে, “সে বিষয়ে মাধব গুরুমশাইকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। তিনি এখন জমিদারবাড়িতেই আছেন। তাঁর পাঠশালা বাবুদের পূজোর দালানে হচ্ছে। এইবার বোধহয় ছুটি হবে। ঐ শুনুন, পাঠশালার ছেলেরা ডাক পড়ছে। আপনারা এইবার যান। সদর দেউড়ি পার হলেই পূজোর দালান দেখতে পাবেন। সেখানেই মাধব গুরুমশাই আছেন।”

লোকটা চলে গেল।

একটু পরে বুলেট ও বজ্র জমিদারবাড়ির সদর দরজা ও দেউড়ি পার হয়ে যখন পূজার দালানের সামনে এলো, পাঠশালা তখন সবে ছুটি হয়েছে। ছেলেমেয়েরা তালপাতার পাততাড়ি বই শ্লেট নিয়ে পূজার দালান থেকে কলরব করতে করতে নেমে আসছে সিঁড়ি বেয়ে। গুরুমশাই এখনো নামেন নি। ছু-একটা ছেলে তখনো সেখানে আছে।

বাইরে থেকে বাড়িটা যত জীর্ণ মনে হয়, ভিতরে ঢুকলে তা মনে হয় না। সদর দরজার পর দেউড়ি। দেউড়ি শেষ হতেই বাঁধানো বিরাট উঠান, উঠানের তিন দিকে চক মিলানো দোতলা বাড়ি, অপর দিকে পূজার দালান। পাঁচ-ছ ধাপ বেয়ে দালানে উঠতে হয়। পূজার দালান প্রায় দোতলা সমান উঁচু। সামনে একটু খোলা রক বা বারান্দা। তারপর চারটা মোটা মোটা থাম দোতলার সমান উঁচু। সেই থামগুলির মাথায় পূজার দালানের ছাদ।

পাঠশালার ছুটি হয়ে গেলেও মাধব গুরুমশাই তাঁর জলচৌকির উপর বসে থেলো হুঁকো টানতে টানতে একজন ছেলেকে কি যেন বলছেন। এ ছেলেটি অন্যদের চেয়ে বয়সে কিছু বড়।

বুলে ও বজ্র জুতো খুলে মোজা পায়েই পূজার দালানে উঠলো।

তাদের দেখে গুরুমশাই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। হুঁকো ও কঞ্চির ছড়িটা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে শশব্যস্তে বললেন, "আসুন, আসুন। কোথা থেকে আসছেন আপনারা?"

বুলেট বললে, "আসছি কলকাতা থেকে। আপনার সঙ্গে একটু দরকার আছে।"

গুরুমশাই একবার পাঠশালার বেঞ্চ ও মাদুরগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, "আচ্ছা, তাহলে আসুন, বৈঠকখানায় বসে আপনাদের সঙ্গে কথা বলি। আপনাবা প্যাণ্ট পরে আছেন, এখানে বসতে অসুবিধা হবে।"

গুরুমশাইয়ের সঙ্গে বুলেট ও বজ্র বৈঠকখানায় ঢুকলো। বৈঠকখানা ঘরটা বেশ লম্বাচওড়া। প্রায় আগাগোড়া নীচু তক্তপোশ পাতা, কেবল একদিকে খানিকটা জায়গায় একটা টেবিল ও চার-পাঁচটা ভারি ভারি চেয়ার। দেওয়ালে খানকয়েক বহু পুরনো অয়েলপেন্টিং টাঙানো। ঘরের নানাস্থানে সাবেকী বহু আসবাবপত্র, এমন কি টানা পাখা ঝাড়লণ্ঠন সবই আছে। অতি প্রাচীন হয়ে গেছে সবই। কিন্তু ভাল করে দেখলে মনে হয়, আজো তাদের যত্ন লওয়া হয়, ঘরটা ব্যবহারও করা হয়।

বুলেট ও বজ্রকে দুখানা চেয়ারে বসিয়ে গুরুমশাই পাঠশালার সর্দার পোড়োকে ডেকে বললেন, "হারান, বাবুদের জন্যে ডাব পেড়ে নিয়ে এস।"

বুলেট বললে, "আবার ডাব কেন?"

গুরুমশাই বললেন, "শুধু ডাব দিয়েই আজ এই রায়বাড়ির অতিথি সৎকার করছি। একদিন কত সাহেব, কত জজ ম্যাজিস্ট্রেট এই বাড়িতে এই ঘরে বসে পোলাউ কালিয়া খেয়ে গেছেন। হুঁঃ। সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই! যাক সে কথা—আপনাদের আগমন কি জন্যে?"

বুলেট বললে, "আমার এক আত্মীয় শহরের বাস ছেড়ে এমনি কোন পল্লীতে এসে একটা বাগানবাড়ি করে বাস করতে চান। আমরা তাঁর জন্যে জমির সন্ধান করছি। রায়বাবুদের কোন উপযুক্ত জমি থাকে তো উচিত দামে তিনি কিনতে পারেন।"

গুরুমশাই বললেন, "বাবুদের এ গ্রামের সব জমিই দেবত্র সম্পত্তির মধ্যে—বিক্রি হবে না। তবে বড় রাস্তার ধারে কিছু খাস জমি আছে। তা বাবুরা বিক্রি করবেন কিনা, দাদা বলতে পারেন। বাবুরা নিজেরা কিছু দেখেন না, থাকেন কলকাতায়। দাদা সবই দেখেন। কিন্তু তিনি তো আজ এখানে নেই, গেছেন বাবুদের সুন্দর-বনের মহলে।"

বুলেট জিজ্ঞাসা করলে, "কবে নাগাত ফিরবেন ?"

চিন্তিত কণ্ঠে গুরুমশাই বললেন, "দাদা যে কবে ফিরবেন, সেইটে বলাই তো আজ এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর জন্যে বিষম ভাবনায় পড়েছি। তিনি এবার প্রায় দু হপ্তা হলো বাবুদের সুন্দরবন মহলে গেছেন। কিন্তু আজও ফিরে এলেন না বা কোন খবরও পাঠালেন না। এমন কখনও হয় নি। দাদা মহলে গেলে চার-পাঁচ দিনের বেশী কখনো থাকেন না। বেশী বারও যান না সেখানে। বছরে মাত্র দুবার—একবার পোষ মাসে আর একবার চৈত্র মাসে। তবে এবার কর্তাবাবুর আদেশ হয়েছে, তাঁদের আদি বাড়ির ভাঙা মন্দিরটাকে সংস্কার করার। তাই এবছর সেখানে প্রায়ই যেতে হচ্ছে।"

বুলেট সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে, "বাবুদের আদি বাড়ি ? সে আবার কোথায় ?"

গুরুমশাই বললেন, "রায়বাবুদের আদি দেশ এটা নয়। আদি দেশ এককালে যেখানে ছিল, তা এখন সুন্দরবনের পাশে বললেই হয়।"

বুলেট বললে, শুনেছি, এই রায়বাবুরা খুব প্রাচীন বনেদী বংশ। এঁদের আদি বাস ছিল তাহলে সুন্দরবনের কাছাকাছি ? তারপর সেখান থেকে এঁরা এইখানে উঠে আসেন। তারপর বাংলাদেশের

সব জমিদার পরিবারের যা হয়, এঁদেরও তাই হয়েছে। এখন তাঁরা কলকাতার বাসিন্দা। কেমন কিনা ?”

গুরুমশাই বললেন, “ঠিকই বলেছেন।”

বুলেট বললে, “তবে এ গ্রামটা তো কলকাতার কাছেই। এরকম জায়গায় বহু জমিদার আজও থাকেন। কিন্তু আপনাদের বাবুরা এমন বাড়িঘর ছেড়ে কলকাতায় থাকেন কেন ? তাঁদের তো শহরে গিয়ে টাকা রোজগার করতে হয় না ?”

গুরুমশাই বললেন, “না। এদের বংশের কাউকে এখনো চাকরি করতে হয় নি। আর আছেই বা কে ? এঁদের দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণ বলতে গেলে এক বিরাট ইতিহাস বলতে হয়।”

উৎসাহের সঙ্গে বুলেট বললে, “বলুন না। আমরা দেশবিদেশের অতীত যুগের রাজারাজড়াদের ইতিহাস মুখস্থ করি, কিন্তু ঘরের পাশের এইসব প্রাচীন বনেদী বংশের কথা কিছুই জানি নে। এ বংশের ইতিহাস কিছু বলেন তো অনেক কথাই হয়তো জানতে পারবো।”

সর্দার পোড়ো হারান এসে তিনটে ডাব কেটে দিয়ে গেল। ডাব খাওয়া শেষ হলো। গুরুমশাই কলকেতে তামাক সাজতে বসলেন।

সবাই চুপ। হুঁকো টানতে টানতে গুরুমশাই বললেন, “রায়বংশের ইতিহাস আমি যে খুব বেশী জানি, তা নয়। তবে ঠাকুরদার কাছ থেকে যা শুনেছি, তাই বলতে পারি।”

বুলেট ও বজ্র সমস্বরে বললে, “তা-ই বলুন।”

গুরুমশাই বলতে আরম্ভ করলেন, “বাবুদের আদি দেশ ছিল সুন্দরবনের কাছাকাছি। বাবুদের প্রাচীন বাড়ির ধ্বংসাবশেষ এখনো সেখানে দেখা যায়, এখন জঙ্গলে ভরা। বাংলাদেশে যখন নীলকুঠির সাহেবদের খুব অত্যাচার চলছিল, তখন এই বাবুদের এক পূর্বপুরুষের সঙ্গে কুঠিয়াল সাহেবদের খুব গোলমাল-লড়াই-দাঙ্গা হয়। বাবুদের বংশের সবাই সে সময় মারা যান। একটি মাত্র ছেলে কোনমতে বেঁচে যায়। নীলকুঠির সাহেবরা সেই ছেলেটাকে পেলে হত্যা করবে, এই

আশঙ্কা করে আমার এক পূর্বপুরুষ তাকে নিয়ে অতি গোপনে রাতারাতি এই গ্রামে এসে ওঠেন, সঙ্গে কিছু টাকাও আনেন। আমার সেই পূর্বপুরুষ এঁদের সরকারে কাজ করতেন। তিনি ছিলেন খুব প্রভুভক্ত ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। শুনেছি, তাঁর চেষ্টায় ও বুদ্ধিবলে সেই ছেলেটি বড় হয়ে এই অঞ্চলের জমিদাব হন। আর তাঁরই দক্ষতায় এঁদের সুন্দরবনের সম্পত্তিও উদ্ধার পায়। এই বংশের সকলের কথা আমি জানি নে, তবে এই বংশের বর্তমান থেকে তিন পুরুষ আগে যিনি কর্তা ছিলেন, তাঁর নাম জানি। তাঁর নাম ছিল হরিনারায়ণ রায়। তাঁর ছিল তিন ছেলে—দ্বিজেন্দ্র, ধীরেন্দ্র আর শৈলেন্দ্র। এই তিনজনের মধ্যে এক শৈলেনবাবু এখন জীবিত আছেন। তিনি সংসারত্যাগী সাধু। অনেক বয়স হয়েছে। এতকাল তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করতেন। বর্তমানে গুরুর আদেশে বর্ধমান জেলার বরাকরে একটা আশ্রম স্থাপন করছেন। তিনিই এই বংশে বর্তমানে সকলেব চেয়ে বয়সে বড়। তাই তিনি সেবায়েত ও দেবত্র সম্পত্তিরও কর্তা। কিন্তু কোন দিনই বিষয়-আসয় নিজে কিছু দেখেন না। দাদাই সব দেখেন। দাদাব সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁর আলাপ-আলোচনা হয় চিঠিপত্রে।”

বুলেট জিজ্ঞাসা করলে, “শৈলেনবাবু মাঝে মাঝে এখানে বা কলকাতায় আসেন তো?

গুরুমশাই বললেন, “না। তিনি আজ উনিশ-কুড়ি বছর এখানে বা কলকাতায় আসেন নি। তবে মেজবাবুর ছেলে বিলেত থেকে ফিরলে একবার তিনি কলকাতায় আসতে পারেন। মেজবাবুর ছেলেকে শৈলেনবাবু দেবত্র সম্পত্তির ভার ও নিজের যা আছে সবই দেবেন, স্থির করেছেন। তাছাড়া এই বংশে আর আছেই বা কে? নিজে তিনি বিয়ে থা করেন নি। মেজবাবুর ঐ ছেলেই একমাত্র বংশধর। ছেলেটিকে আমি দেখি নি বহুদিন। দাদা বলেন, ছেলেটি একেবারে হীরের টুকরো—ডাক্তারী পড়তে বিলেতে গেছে। এই সময় ফিরে আসার কথা। হয়তো ফিরেছেও।”

বুলেট জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি ঠিক জানেন, শৈলেনবাবু আর বিলেতে-পড়া ছেলেটি ছাড়া এই বংশের আর কেউ কোথাও নেই ?"

একটু ভেবে গুরুমশাই বললেন, "আর একজন ছিল—এই বংশেরই ছেলে। সে বেঁচে আছে কি মরে গেছে, কেউ বলতে পারে না। সে হলো শৈলেনবাবুর বড়দাদার ছেলে। তার নাম ছিল সুরেন। ডাক নাম মণ্টু। কখনো শুনি, সুরেন সাধু হয়েছে। আবার কখনো শুনি, চুরি না ডাকাতি করে সে জেলে গেছে। সুরেনই হলো এই বংশের একমাত্র কুলাঙ্গার।"

বুলেট জিজ্ঞাসা করলে, "সুরেন যদি এখন বেঁচে থাকে, তাহলে তার বয়স কত হতে পারে, বলতে পারেন ?"

মনে মনে একটা হিসাব করে গুরুমশাই বললেন, "সুরেনের বয়স আমার চেয়ে বছর আট-দশ কম। তাহলে বর্তমানে তার বয়স হবে চল্লিশ-বিয়াল্লিশ।"

বুলেট আবার জিজ্ঞাসা করলে, "সুরেনকে দেখতে কেমন, গুরুমশাই ?"

বুলেটের প্রশ্ন করার ধরন দেখে গুরুমশাই একটু অবাক হলেন। পরক্ষণে, এটা ছোকরা বয়সের কৌতূহল ধরে নিয়ে, মৃদু হেসে বললেন, "সুরেনকে বহুদিন দেখি নি। দেখেছি প্রায় কুড়ি-বাইশ বছর আগে। তা ওর স্বভাবচরিত্র যাই হোক, চেহারাটা এই বংশের অন্য সকলেরই মতো অর্থাৎ বেশ সুপুরুষই হবে। এই সুরেনের জন্যেই এই জমিদার বংশ দেশত্যাগী হয়েছিল।"

বিস্মিত হয়ে বুলেট বললে, "বলেন কি ? ওর জন্যে জমিদার বংশ দেশত্যাগী হলো ?"

গুরুমশাই বললেন, "হাঁ। ওর জন্যেই এই জমিদার বংশের মুখে চুনকালি পড়েছিল। সে কাহিনীও বলি—বড় কর্তা অর্থাৎ সুরেনের বাবা দ্বিজেনবাবু মারা যাবার পর সুরেনের হাতে বহু টাকা পড়ে। অর্থই অনর্থের মূল। অল্প বয়সে হাতে টাকা পড়লে অনেকের যা

হয়, সুরেনেরও তাই হলো। ওর মতিগতি খারাপ হতে বেশী সময় লাগলো না। ইতিমধ্যে ওর মাও মারা গেলেন। তখন আর দেখে কে! বহু বন্ধুবান্ধব ওর জুটলো—যত হতভাগার দল। ফলে, সুরেনের টাকা ফুরোতে বেশী দেরি হলো না। কিন্তু ওর বন্ধুরা তখনও ওকে ছাড়লে না। সমানে টাকা উড়োতে লাগলো। কিছুদিন পরে জানা গেল, সুরেন কাজীপুরের শেখদের কাছে তার যথাসর্বস্ব মায় ভিটা-ভদ্রাসন পর্যন্ত বাঁধা দিয়ে টাকা নিয়েছে। তারা কোর্ট থেকে ডিগ্রি করেছে। মেজবাবু জানতে পেরে বহু টাকা গুনাগারি দিয়ে সেই সব সম্পত্তি রক্ষা করে নিজের নামে লিখে নেন। সুরেনের নামে কোন সম্পত্তি থাকলে ও আবার এই রকম করবে, তাই মেজবাবু এই ব্যবস্থা করেছিলেন। যাই হোক, এর পরও সুরেনকে তিনি মাসে মাসে কিছু হাতখরচ দিতেন। বাড়ির ছেলের মতোই তাকে রেখেছিলেন। সুরেন বন্ধুবান্ধব নিয়ে বার মহলেই থাকতো। মাঝে মাঝে কোথায় চলে যেত। আবার দু-চার দিন বাদে ফিরে এসে বন্ধুদের নিয়ে গান-বাজনা আমোদ-ফুর্তিতে খুব খরচ-খরচা করতো। কোথা থেকে সে এত টাকা পেত, কেউ ভেবে পেত না। তারপর একদিন সকাল বেলায় দেখা গেল, পুলিসের দল বাড়ি ঘেরাও করেছে। তারা ওয়ারেণ্টের বলে বাড়ি খানাতল্লাশী করলে। সুরেনের ঘর থেকে বহু সোনার গহনা বের হলো। পুলিস ইন্স্পেক্টার সুরেনের কোমরে দড়ি বেঁধে এই গ্রামের রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে গেল। ওরা ছিল কলকাতার পুলিস। মেজবাবুকে কোন খাতির করলে না, তাঁর অনুরোধও শুনলে না। মেজবাবু চেষ্টা করেছিলেন, পুলিস যাতে সুরেনকে সকলের সামনে কোমরে দড়ি বেঁধে না নিয়ে যায়। কিন্তু তাঁর সে অনুরোধ ব্যর্থ হলো। অপমানে দুঃখে মেজবাবু এক হপ্তার মধ্যে সপরিবারে দেশত্যাগী হলেন।"

বুলেট ও বজ্র গুরুমশাইয়ের কথা মন দিয়ে শুনছিল। হঠাৎ একটা লোক গুরুমশাইয়ের সামনে এসে দাঁড়াতেই গুরুমশাই উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হরিদাস! দাদার কোন খবর পেলে?"

হতাশ কণ্ঠে হরিদাস বললে, "না। কোন খবরই পাওয়া গেল না। মীরবহরপুরের কাছারিতে গিয়ে, তশীলদারবাবুর কাছে শুনলুম যে, তিনি ওখানে তেশরা তারিখে গিয়ে দুদিন থেকে চলে গেছেন। তারপর তাঁর কোন খবরই তশীলদার জানে না।"

গুরুমশাইয়ের চোখমুখ কালো হয়ে উঠলো। বিষম বিপন্ন কণ্ঠে বললেন, "তাহলে দাদা গেলেন কোথায় ? তেশরা তারিখে দাদা মহলে গিয়ে দুদিন থেকে চলে আসেন, অর্থাৎ তিনি পাঁচুই ওখান থেকে রওনা হন। আসতে ধর দুদিন, তাহলে সাতুই তাঁর এখানে ফিরে আসার কথা। কিন্তু আজ তো উনিশে হল। তিনি তো ওদিকে কোথাও থাকেন না, এক কাকদ্বীপে ছাড়া। তাও যেতে আসতে দু-এক ঘণ্টার জন্যে বিশ্রাম করেন সেখানে। আচ্ছা হরিদাস, তুমি কি কাকদ্বীপ হাটের বনমালী হালদারের ওখানে খবর নিয়েছিলে ?"

হরিদাস বললে, "হ্যাঁ, তাও নিয়েছিলুম। বনমালী বললে, নায়েব মশাই মহলে যাবার সময় ওদের দোকানে থেকে খাওয়াদাওয়া করেছিলেন। কিন্তু তারপরের কোন খবর সে জানে না।"

গুরুমশাই বললেন, "দাদা মহল থেকে ফেরবার সময়ও বনমালীর ওখানে হয়ে আসেন। বনমালী দাদার বিশেষ বন্ধু। ···তাই তো মহা ভাবনার কথা হল। আচ্ছা হরিদাস, তুমি মহলে গিয়ে কি দেখলে—বাবুদের মন্দিরটা কি পরিষ্কার হয়েছে ?"

হরিদাস জানালে, "শুধু ভিতরটা খুলতে বাকী। আর সব পরিষ্কার করা হয়েছে। তশীলদারমশাই লোক খাটাচ্ছে। দুজন হিন্দুস্থানী লোক আর একজন সাধুকে দেখলুম কাছারিতে।"

বুলেট ও বজ্র হরিদাসের কথা শুনছিল। বুলেট জিজ্ঞাসা করলে, "একজন সাধুকে সেখানে দেখেছেন ? আচ্ছা, সাধুটি দেখতে কেমন ?"

অল্পবয়স্ক অপরিচিত প্রশ্নকর্তার দিকে একটু তাকিয়ে থেকে হরিদাস বললে, "সাধুদের সাধারণত যেমন দেখতে হয়, সেই রকমই। পরনে গেরুয়া আলখাল্লা, মাথায় বড় বড় চুল, মুখে দাড়ি গোঁফ, গায়ের

রং বেশ ফরসা। তবে চোখে নীল চশমা। শুনলুম, সাধুটি ঐ অঞ্চলের গরীব দুঃখীদের বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথি ওষুধ দেন।"

বুলেট ও বজ্রের চোখে চোখে কি যেন কথা হলো। গুরুমশাই কিন্তু সাধুটির সম্পর্কে কোন আগ্রহই দেখালেন না। বুলেটকে বললেন, "ওরকম অনেক সাধুসন্ন্যাসী বা চকদার-লাটদার বাবুদের কাছারিতে এসে মাঝে মাঝে দু-চার দিনের জন্যে থেকে যায়। কিন্তু দাদার কি হল? ব্যাপারটা মোটেই সহজ মনে হচ্ছে না। বাড়িতে সবাই খুব ভাবছে। কি খবরই বা তাদের দেব?"

সবাই নির্বাক। গুরুমশাইও চুপ করে গেছেন। তাঁর চোখে-মুখে উদ্বেগ-দুশ্চিন্তার ছাপ পরিস্ফুট। একটু পরে বুলেটদের দিকে তাকিয়ে অসহায় কণ্ঠে তিনি বললেন, "আপনারা তো শহরের লোক, সব কথাও তো শুনলেন, এখন কি করি বলুন তো? পুলিসে জানাব?"

বুলেট উত্তর দিলে, "নিশ্চয়ই। আর আপনি একবার নিজে সেখানে যান। একলা যাবেন না—সঙ্গে দু-একজনকে নিয়ে যাবেন।"

গুরুমশাই বললেন, "ঠিকই বলেছেন। আমি কাল সকালেই রওনা হব। আর আজ রাত্রেই হাজীপুর থানায় জানিয়ে আসবো।"

বজ্র জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা, আপনার দাদার বা এই জমিদারদের কোন বিপক্ষ বা শত্রু আছে কি?"

গুরুমশাই বললেন, "না। তাহলে তো কথা ছিল না। দাদার সে রকম কোন শত্রু থাকতেই পারে না। দাদা অতি সৎ ও সজ্জন। আর জমিদারদেরই বা শত্রু বা বিপক্ষ থাকবে কে? তাঁরা দেশেও থাকেন না বা জমিদারীও নিজেরা দেখেন না।"

বুলেট জিজ্ঞাসা করলে, "ওখানকার তশীলদার লোকটা কেমন?"

গুরুমশাই বললেন, "লোকটা শুনেছি তেমন ভালো নয়, একটু হাতটান আছে। তবে সে দাদার সঙ্গে কোন শত্রুতা করবে না—দাদাই তাকে চাকরি দিয়েছিলেন, আর সে এদিককারই লোক।"

বুলেট আবার জিজ্ঞাসা করলে, "লোকটার বাড়ি কোথায়? ওর নাম কি?"

গুরুমশাই বললেন, "তার নাম হাবু নস্কর, পৈলানে বাড়ি।"

বুলেট দু-চার সেকেণ্ড কি যেন ভাবলে তারপর আবার গুরুমশাইকে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা, কি জন্যে শৈলেনবাবু ভাঙা মন্দিরটা পরিষ্কার করাচ্ছেন, বলতে পারেন?"

গুরুমশাই উত্তর দিলেন, "তার কারণ দাদার কাছে শুনেছি। ওই মন্দিরের ভিতের মধ্যে কি একটা জিনিস আছে, সে জিনিসটা জমিদারদের বংশের নয়,—এঁদের পূর্বপুরুষদের একজনের কাছে বহু কাল আগে কে যেন রেখেছিল গচ্ছিত সম্পত্তি হিসাবে। শৈলেন-বাবু কি এক দরকারে জমিদারীর পুরনো কাগজপত্র ঘাটতে ঘাটতে ঐ কথা জানতে পেরে, দাদাকে লেখেন ভাঙা মন্দিরের ইটপাথর পরিষ্কার করে সেই জিনিসটা উদ্ধার করতে। জিনিসটা যে কি, তা আমি জানি না। দাদাও জানেন না। ইদানিং দাদার সঙ্গে শৈলেনবাবু এই বিষয়ে প্রায়ই পত্রালাপ করছেন। দাদা এবার মহলে যাবার পরও তাঁর একটা চিঠি দাদার নামে এসেছে। এইখানেই সেটা রয়েছে, সেটা দেখলে বোধহয় বুঝতে পারবেন।"

গুরুমশাই একটা খোলা খাম বুলেটের হাতে দিলেন। বুলেট ও বজ্র চিঠিখানা পড়তে লাগলো।

"কল্যাণীয়েষু,

শ্রীচরণ, মন্দিরের কাজটা কত দূর হলো? যত শীঘ্র পার, জিনিসটা উদ্ধার করবে। ঐ জিনিসটা আমাদের কোন পূর্বপুরুষের কাছে যিনি গচ্ছিত রেখেছিলেন, তাঁর বর্তমান বংশধরকে প্রত্যর্পণ করা আর বীরেনকে সব সম্পত্তি বুঝিয়ে দেওয়া, এই দুটি সাংসারিক কর্তব্য এখনও আমার আছে। এসব সাংসারিক কাজে আমার অন্তর আর থাকতে চাইছে না। ডাক এসেছে। তার আগে পাথেয় কিছু সঞ্চয় করতে ইচ্ছা করি। তুমি যত শীঘ্র পার আমাকে এই দায়িত্ব দুটি থেকে

মুক্তির ব্যবস্থা কর। বীরেন বিদেশ থেকে কৃতী হয়ে ফিরে আমাকে পত্র দিয়েছে। আমি মধ্যে নানা স্থানে ভ্রমণ করছিলাম, তাই ওকে এখানে আসতে নিষেধ করেছিলাম। এইবার থেকে বরাকরে থাকবো। ওকে আসতে লিখেছি। দু-এক দিনের মধ্যে ও আমার কাছে আসবে। বীরেনকে জমিদারীর কাগজপত্র দেওয়া ও ঐ সব বুঝিয়ে দেওয়ার ভার তোমার উপর। আমার অবসর খুবই কম—এখানে আশ্রম তৈরির কাজে প্রায় সর্বদাই ব্যস্ত থাকতে হয়। অত্র পত্রে তোমাকে একটি খুব আনন্দের সংবাদ জানাচ্ছি—হঠাৎ মণ্টুকে ফিরে পেয়েছি। তার জীবনে মহা পরিবর্তন ঘটেছে—সত্যই সে আজ অতি সৎ ও সাধু প্রকৃতির মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে। তীর্থে তীর্থে সে সাধুসঙ্গ করে বেড়ায়। ইদানীং আমাদের আশ্রমে মধ্যে মধ্যে আসে, দু-চার দিন করে থাকে। এটা আমাদের বংশের উপর শ্রীভগবানের অসীম করুণা বলে মনে করি। আর এক কথা, আমার হিসাব থেকে খড়দার শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া আশ্রমের শ্রীধর বাবাজী মহাশয়কে ৫০৲ টাকা সাহায্য পাঠিও।

বরাকর	স্নেহাশিস সহ
১৩ই মাঘ ১৩৬২	শ্রীশৈলেন্দ্রনারায়ণ রায়”

চিঠি পড়া শেষ হলে বুলেট ও বজ্র যাবার জন্যে উঠলো। বুলেট বললে, “গুরুমশাই, আজ আমরা আপনার বড় চিন্তার দিনে এসে অনেক বিরক্ত করে গেলুম, কিছু মনে করবেন না। আপনাকে বড় ভালো লেগেছে আমাদের। আপনার আত্মীয়ের মতো মিষ্টি মধুর ব্যবহার কোন দিন ভুলতে পারবো না। আবার হয়তো আপনার কাছে আসবো। এখন যাই।”

গ্রামের পথ ছেড়ে বুলেট ও বজ্র সাইকেলে করে যখন ডায়মণ্ড হারবার রোডে এসে উঠলো তখন বিকাল হয়েছে।

বিরাট বিরাট ফাঁকা মাঠ। তার মাঝখান দিয়ে চলে গেছে

পীচঢালা সোজা রাস্তা—ডায়মণ্ড হারবার রোড। বিকাল বেলার দক্ষিণে হাওয়া বইছে হু হু করে, বুলেট ও বজ্রের সাইকেল চালাতে খুবই সুবিধা।

চলতে চলতে বজ্র জিজ্ঞাসা করলে, "আজ আমাদের যাত্রার কি রকম ফল হলো মনে হয়?"

বুলেট বললে, "খুবই ভালো। এখন আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে ঐ সাধুটির সন্ধান নেওয়া।"

বজ্র বললে, "এই সাধুটি কে? বীরেনদার কাকা শৈলেনবাবু যে নন তা নিশ্চিত। তাহলে সাধুটি কে?"

বুলেট বললে, "সুন্দরবনে বীরেনদাদের জমিদারীতে একবার যেতে হবে। সাধুটি বোধহয় সেখানেই আছেন। গুরুমশাইয়ের লোক হরিদাস সাধুটির যে বর্ণনা দিলে, তার বর্ণনার সঙ্গে বীরেনদার অপহরণ-কারী সাধুটির বেশ মিল আছে, মনে হলো। আমার ধারণা, এই দু জায়গার সাধু একই লোক।"

বজ্র বললে, "আমাবও তাই মনে হয়। কিন্তু কে এই সাধুটি? একবার মনে হয়েছিল, বোধহয় সুরেন। কিন্তু শৈলেনবাবুর চিঠি পড়ে সে সন্দেহ কেটে গেছে। শৈলেনবাবুই লিখছেন, সুরেনের জীবনের ধারা একদম পাল্‌টে গেছে।"

বুলেট বললে, "আমাদের একবার সুন্দরবনে আর একবার বরাকরে শৈলেনবাবুর আশ্রমে যেতে হবে। আমার মনে হয়, শৈলেনবাবুর কাছ থেকে বা অন্য কোন ভাবে কেউ জানতে পেরেছে যে, ওদের আদি বাড়ির মন্দিরের তলায় একটা মূল্যবান জিনিস আছে আর এখন সেটা উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। সেই লোকটি অর্থাৎ যে ঐ গুপ্ত জিনিসের খবর পেয়েছে, সে নিজে ঐ সব হাত করার মতলবে বীরেনদাকে গুম করেছে। গুরুমশাইয়ের দাদা নায়েবমশাইয়ের কি হলো, কোথায় গেলেন তিনি, সেটাও ভাববার বিষয়।"

ডায়মণ্ড হারবার রোড ধরে উত্তর দিকে ঘণ্টা দুই সাইকেল

চালাবার পর বুলেট ও বজ্র পৈলান বলে একটি গ্রামের দক্ষিণ সীমানায় এসে পৌঁছলো।

বুলেট জিজ্ঞাসা করলে বজ্রকে, "পৈলান জায়গাটার নাম মনে পড়ছে ?"

বজ্র উত্তর দিলে, "হুঁ, এইখানেই সেই তশীলদার হাবু নস্করের বাড়ি।"

সাইকেলের গতি কমিয়ে বুলেট বললে, "চল আজই সেই হাবু নস্করের সন্ধান নিয়ে যাই।"

বজ্র বললে, "সে তো মহলে।"

বুলেট উত্তর দিলে, "সেইজন্যেই তো যাচ্ছি। এইসময়েই তার সন্ধান নেবার সুবিধা হবে।"

পৈলানে আজ হাটবার।

ছোটখাটো সুন্দর হাট। হাটের মধ্যে বহু ব্যাপারী চাল বিক্রি করছে। প্রায় তিন দিকে সারি সারি স্থায়ী দোকান। বুলেট ও বজ্র একটা ময়রার দোকানে ঢুকে খাবাবের অর্ডার দিলে।

খাবার খেতে খেতে চিন্তান্বিত কণ্ঠে বুলেট বজ্রকে বললে, "এখন তাহলে কি করা যায় বলো তো ? ব্যাপারীটাকে তো দেখছি না। আজ হাটে আসে নি বোধহয়।"

বুলেটের মুখের দিকে চেয়ে বজ্র উত্তর দিলে, "তাই তো মনে হচ্ছে।"

দোকানীকে উদ্দেশ করে বুলেট বললে, "আপনি কি এইখানের বাসিন্দা ?"

দোকানদার উত্তর দিলে, "হ্যাঁ, কেন বলুন তো ?"

বুলেট বললে, "দেবেন নস্করের বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন ?"

বজ্র কি বলতে যাচ্ছিল, বুলেট তাকে আঙুলের টিপ মারতেই সে থেমে গেল।

দোকানী একটু ভেবে বললে, "দেবেন নস্কর ! ও নামে তো কেউ নেই এ গ্রামে। কি করে লোকটা ?"

বুলেট উত্তর দিলে, "এই হাটে চাল বিক্রি করে। গেল হপ্তায় হাটে আমি চাল কিনতে এসেছিলুম। সে আমাকে এক মণ পুরনো চাল দেবে বলে পাঁচ টাকা আগাম নিয়েছে।"

দোকানী বললে, "হেটো ব্যাপারীকে আগাম টাকা দিতে গেলেন কেন? হাটে ওদের কারো কোন স্থায়ী জায়গা নেই। ওদের বেশীর ভাগই দূর দূর গ্রাম থেকে হাটের দিন এখানে আসে। কে কোন্ গ্রাম থেকে আসে তার ঠিক নেই, বেচাকেনা ক'রে চলে যায়। আচ্ছা, সে কি বলেছিল, এই পৈলান গ্রামেই তার বাড়ি?"

বুলেট উত্তর দিলে, পৈলানে কে হাবু নস্কর আছে, তার কাছে সে চাল রেখে দেবে বলেছিল।

দোকানী বললে, "হাবু নস্করকে জানি। হাটের পূব দিকে যে সরু রাস্তাটা গেছে, ঐ রাস্তা ধরে কিছু দূর গেলে একটা বাঁশের সাঁকো আছে; সাঁকোর ওপারে হাবু নস্করের বাড়ি। আমার বাড়িও প্রায় ঐখানে। কিন্তু হাবুদা তো বাড়ি নেই। সে প্রায় সব সময়েই বিদেশে থাকে। গেল হপ্তায় বাড়ি এসেছিল। বাড়িতে খুব ঘটা করে হরিলুট দিলে। কোন্ এক জমিদারের নায়েব হয়েছে সেই জন্যে। আমরা তার বাড়িতে প্রসাদ পেতে গিয়েছিলুম। কলকাতা থেকে দুজন হিন্দুস্থানী এসেছিল। তারা 'রাম গান' করলে। তার পর দিন জমিদারেব মোটর গাড়ি করে হাবুদা মহলে গেছে। আজো বাড়ি ফেরে নি জানি।"

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি শেষ করে দোকানী অন্য দিকে চলে গেল। দোকানে কয়েকজন খরিদ্দার ঢুকেছে।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বুলেট বললে, "তাহলে টাকা পাঁচটা বোধহয় গেল।"

বুলেট ও বজ্র উঠে পড়লো।

... ...

ক্রীং—ক্রীং—ক্রীং—

রাত প্রায় সাড়ে সাতটা। বাইরের ঘরে চেয়ারে বসে বুলেট পড়ছে। ফোন বেজে উঠলো। বুলেট রিসিভার তুলে জিজ্ঞাসা করলে, "কে ?...হাঁ আমি বুলেট...ওঃ পোনা ? এসেছে...এক্ষনি যাচ্ছি...তুমি কারখানায় ফিরে যাও...আমাদের ওখানে পৌঁছবার আগেই ও যদি বেরিয়ে যায় তো, পিছু নেবে...ট্যাক্সি করবে...ভাড়া আমি দেবো...জগুবাবুর বাজারের সামনে আমাকে পাবে...যাচ্ছি।"

বুলেট রিসিভার রেখে দিয়ে আবার তুললে বজ্র আর বোমাকে খবর দেবার জন্যে। তাদের দুজনের আজ শক্তিসংঘের হরিজন নাইট স্কুলে পড়াবার ডিউটি। বুলেট সেখানে ওদের ফোন করলে।

পনের মিনিটও দেরি হল না, বুলেট, বজ্র ও বোমা জগুবাবুর বাজারের সামনে এসে ট্যাক্সি থেকে নামতেই বুলেটের সঙ্গে পোনার চোখাচোখি হলো। বুলেট ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে বজ্র ও বোমাকে নীচু গলায় কি বলতে তারা চলে গেল।

পোনাকে নিয়ে বুলেট একটা ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়ালো। চারদিক দেখে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কি খবর ? সাধু এসেছে ? এখনি চলে যাবে নাকি ?"

পোনা আস্তে উত্তর দিলে, "না। এখন যাবে না। তবে ওরা সবাই খুব ভোরে পাঁচটা-সাড়েপাঁচটা নাগাত সাধুর সঙ্গে কোথাও যাবে—খুব দূর দেশে মনে হচ্ছে। তাই পরামর্শ করছে। আমাকে সাধুব মোটরে ছ টিন পেট্রোল রাখতে বলেছে। আমি রেখে দিয়ে এসেই আপনাকে ফোন করেছি। গাড়িখানা কারখানার সামনে আছে চাবুরলাট গাড়ি, নম্বর বি. এল. বি. ৬৪৬৪, ছাদ খোলা। দেখতে চান তো দেখুন গিয়ে। বোধহয় বর্ধমানের নম্বর।"

বুলেট বললে, "সে হবে'খন। সাধু তোমাদের কারখানায় আছে তো ?"

পোনা বললে, "আছে। আরও অনেকে আছে। খুব পরামর্শ হচ্ছে। তাই আমায় ছুটি দিলে।"

বুলেট বললে, "তুমি বেশীক্ষণ এদিকে থেক না। যাও। আমি ঐ দিকেই যাচ্ছি।"

বুলেট ও পোনা দুজন দুদিকে চলে গেল।

আগলু মাহাতো কোম্পানীর কারখানার একটা দরজা গলির মধ্যে। কারখানার সব দরজার ঝাঁপ ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। কারখানার মধ্যে একটা কম-পাওয়ারের আলো জ্বলছে। ভিতরে তক্তপোশের উপর চারজন লোক গভীর পরামর্শ করছে খুব সংগোপনে।

তক্তপোশের ঠিক মাঝখানে বসেছে সাধু, তার পাশে আগলু। এদের দুজনের সামনে বসে আছে একজন হিন্দুস্থানী আর একজন বাঙালী। বাঙালীটি প্রৌঢ় লম্বা—পাতলা চেহারা, পরনে গলা-আঁটা ছিটের কোট আর আধ ময়লা ধুতি চাদর।

সাধু আগলুকে কি বলতে সে ক্যাশবাক্স থেকে খানকয়েক নোট বের করে লম্বা লোকটিকে দিলে।

সাধু বললে, "নায়েব মশাই, এখন এই নিয়ে যান। এক্ষনি বেরিয়ে পড়ুন। মোমিনপুর পর্যন্ত ট্যাক্সি করে যাবেন। তা না হলে ডায়মণ্ড হারবারেব বাস পাবেন না। ভোরের প্রথম বাসেই কাকদ্বীপে যাবেন। কালই মহলে পৌঁছনো চাই। আপনি ওখানে গেলে, তবে লছমন আসবে। আমরা ভোর ছটার মধ্যে যাত্রা করবো। এই সোমবারের পরের সোমবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে। যা যা বলেছি, সবই ইতিমধ্যে ঠিক করে রাখবেন।"

নায়েব মশাই সাধুকে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি কি এঁদের সঙ্গেই ফিরবেন ?"

সাধু বললে, "বলতে পারছি নে। আট-দশ দিন দেরিও হতে পারে।"

নায়েব মশাই চলে গেল। ওরাও ক'জন উঠে পড়লো। বোধহয় সবাই এখন আগলুর বাড়িতে যাবে। আগলুর বাড়ি কারখানার সামনেই।

বুলেট এতক্ষণ কারখানার পাশে একটা অন্ধকার জায়গায় আত্ম-গোপন করে ওদের আলোচনা শুনছিল। সবটা না শুনতে পেলেও কিছু কিছু শুনেছে।

কারখানা বন্ধ করে আগলুরা বের হবার আগেই বজ্র ও বোমাকে ডেকে নিয়ে বুলেট পদ্মপুকুর রোড ধরে চলতে শুরু করে।

সব শুনে বজ্র বললে, "এই সেই নায়েব মশাই! গুরুমশাইয়ের দাদা! এই হীন ষড়যন্ত্রের একজন! অথচ গুরুমশাই বলেছিল, তার দাদা অতি সৎ লোক—খুব বিশ্বাসী। এই জমিদার বংশের ওরা নুন খেয়ে আসছে বংশপরম্পরায়। ওঃ লোক চেনা ভার!"

বুলেট বললে, "এখনি কিছু ধারণা করা ঠিক হবে না। এই নায়েব মশাই গুরুমশাইয়ের দাদা নাও হতে পারে। বীরেনদার জমিদারীতে অন্য নায়েবও তো থাকতে পারে। যাই হোক, এখন সে কথা ভাববার সময় নেই। এক্ষনি আমাদের অর্থাৎ আমি, তুমি, বোমা আর বাঘ, এই চারজনকে প্রস্তুত হতে হবে। আমি আত্মরক্ষার ও ছদ্মবেশের এবং আর যা যা জিনিস দরকার হতে পারে, সে সবেরই ভার নিচ্ছি। বোমা, তোমার গাড়ি আর পেট্রোল যতটা পার, ঠিক করে রাখবে। সবাই মনে রেখ, ভোর পাঁচটার সময় আমাদের বাড়ি থেকে সবাই রওনা হবো। সাধুদের গাড়ি ছাড়বে সকাল ছটা নাগাত। কারখানা থেকেই ওরা যাত্রা করবে। আমরা আগে গিয়ে ওদের গাড়ি থেকে কিছু দূরে অপেক্ষা করবো। তারপর ফলো করবো—যতদূর ওরা যায়।"

বুলেটের কথায় সবাই সায় দিলে।

শীতকালের সকাল—সাড়ে পাঁচটা। ভোর হতে দেরি আছে এখনো। কলকাতা শহরে এখনো ব্যস্ততা ও কোলাহল শুরু হয় নি। রাস্তায় সবে লোকচলাচল শুরু হয়েছে। জগুবাবুর বাজারের দোকান-দাররা কেউ কেউ সবে ঘুম ভেঙে উঠেছে।

বি. এল. বি. ৬৪৬৪ গাড়িখানা ভবানীপুর জগুবাবুর বাজারের উত্তর দিকের রাস্তা মোহিনীমোহন রোড থেকে বের হয়ে আশু মুখার্জির রোডে পড়ে সোজা উত্তর দিকে চলতে শুরু করলো।

আগলু গাড়ি চালাচ্ছে। তার পাশে সাধু। পিছনের সীটে বসে আছে আর একজন লোক। লোকটি হিন্দুস্থানী, চেহারা বেশ লম্বা-চওড়া, খদ্দরের ধুতিপিরানপরা, মাথায় গান্ধি টুপি। বুলেটের বিশ্বাস, লোকটা মাহাতো—কারখানার অন্যতম মালিক।

গাড়িখানা চলছে মাঝারি গতিতে। কলকাতা হাওড়া পার হলো তারা। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুখানা গাড়িই শহরের সীমা ত্যাগ করলে—একটি অপরটির অলক্ষ্যে কিছু ব্যবধান রেখে।

ফাঁকা গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। যানবাহন বিরল। আগলু গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিলে।

বি এল. বি. ৬৪৬৪ চলেছে তো চলেইছে, থামছে না কোন জায়গায়। যাচ্ছে সোজা উত্তরমুখো। চন্দননগর এসে গেল। আগলু গাড়িখানা রাস্তার পাশের একটা বড় দোকানের সামনে থামাতেই, সেখান থেকে একটা লোক ছুটে এসে মাহাতোর সঙ্গে কি কথাবার্তা বললে। মাহাতো তার হাতে কি একটা প্যাকেট দিতেই সে দ্রুত চলে গেল।

আবার গাড়ি চলতে শুরু করলে।

রোদ বেশ জোর উঠেছে। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে গাড়ি চলাচলও বেড়েছে। বেলা প্রায় সাড়ে নটা। বি. এল. বি. ৬৪৬৪ বর্ধমান শহরে এসে গেল। আগলু কার্জন গেটের কাছে গাড়ি থামালে।

সাধু ও আগলু গাড়ি থেকে নেমে গেল। মাহাতো গাড়িতেই বসে রইল।

খানিকটা দূরে বুলেটদের গাড়িও থেমেছে। বজ্র বুলেটকে বললে, "ওরা বোধহয় এখানেই খাওয়াদাওয়া সারবে। আমরাও কিছু খেয়ে নিলে কেমন হয়।"

গাড়ি থেকে নেমে সাধু ও আগলু যে দিকে যাচ্ছিল, সেদিকে চোখ রেখেই বুলেট উত্তর দিলে, "হাঁ খেয়ে নিতে হবে বইকি। আর সাধুরা কোন্ দিকে যাচ্ছে, সে খবরও রাখতে হবে। আমি ওদের দিকে যাই। সাধুরা খুব সম্ভব কোন হোটেলে বা দোকানে ঢুকবে। বজ্র, তুমি আর বাঘ কোন দোকান থেকে খেয়ে এস। আমি যে দিকে যাচ্ছি, সোদকে যেও না। বোমা গাড়িতেই থাক। ওর জন্যে তোমরা খাবার এনো।"

বুলেট গাড়ি থেকে নেমে গেল।

সাধু আগে আগে যাচ্ছে। তার হাতে একটা ডাক্তারি ব্যাগ। আগলু তাকে অনুসরণ করছে। তার হাতেও একটা র‍্যাশন ব্যাগ—কিসব জিনিসে ভর্তি। তুজনে চারদিক লক্ষ্য করতে করতে চলেছে। কিছু দূর আসতেই হঠাৎ একজন লোক এসে সাধুকে কি বললে। সাধু আগলুকে ইশারা করতে সে ঐ লোকটার হাতে র‍্যাশন ব্যাগটা তুলে দিলে। লোকটা মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সাধু ও আগলু একটা ময়রার দোকানে ঢুকে একটা বেঞ্চে বসে সীতাভোগ আর মিহিদানার অর্ডার দিলে।

দোকানটা বেশ বড়। এসময় লোকের ভিড় নেই বললেই হয়। তবু সাধু ও আগলু কথা কইছে খুব নীচু গলায়—অতি সাবধানে সব দিকে লক্ষ্য রেখে। যে লোকটা আগুলুর কাছ থেকে র‍্যাশান ব্যাগ নিয়ে গিয়েছিল, সে এসে সাধুকে এক তাড়া নোট দিলে। না গুণেই সাধু সেগুলি বেনিয়ানের পকেটে রেখে উঠে দাঁড়ালো। আগলুও উঠলো।

বুলেট ঐ দোকানের একটা আলমারির পিছনে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছিল। সে চায়ের কাপ প্লেট টেবিলের উপর রেখে সট করে দোকানের পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

প্রায় মিনিট দশেক আগে বজ্র ও বাঘ মোটরে ফিরেছে। বজ্র বোমার জন্যে খাবার ও ফ্লাস্কে করে চা এনেছে। বোমা খাবার

খাচ্ছে। বজ্র বললে, "সাধুদের যে স্থানে স্থানে চোরাই কারবার আছে, তা বেশ বোঝা যায়।"

হঠাৎ বোমা ব্যস্ত হয়ে বললে, "দেখ দেখ, সাধুরা তাদের মোটরে ফিরছে। আমাদেরও এখুনি রেডি হওয়া দরকার।"

বজ্রও ব্যস্ত হয়ে উঠলো, "তাইতো বুলেট এখনও—

"গাড়ির পিছন থেকে উত্তর এলো, "আমি এখানে আছি, তোমরা রেডি হও। সাধুদের গাড়ি চলতে আরম্ভ করলেই আমি উঠবো।"

ত্বখানা গাড়ি আবার গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে চলেছে হু হু করে— উত্তর-পশ্চিমমুখো। একটার সঙ্গে অপরটি খানিকটা দূরত্ব রেখে চলেছে। বেলা হয়েছে বেশ।

বর্ধমান শহর—গলসী—বুদবুদ চটি—পানাগড়—তুর্গাপুর জঙ্গল— ফরিদপুর ফাঁড়ি পার হয়ে সাধুদের গাড়ি অণ্ডালের চৌমাথায় এসে দাঁড়ালো।

এখানকার দৃশ্য বড় সুন্দর। উঁচু নীচু মাঠের মধ্যে দিয়ে গেছে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। তাকেও তাই উঁচু নীচু হতে হয়েছে। রাস্তার তুপাশে বড় বড় কৃষ্ণচূড়া হরীতকী বয়ড়ার গাছ—অত চওড়া রাস্তাটাকেও ছেয়ে ফেলেছে। দূরে দূরে বহু কোলিয়ারীর চান্‌ক্ দেখা যায়।

অণ্ডাল-উখরা রোড ও গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের চৌমাথায় বি. এল. বি. ৬৪৬৪ গাড়িখানা থামতেই আগলু নেমে পড়ে। সাধুদের গাড়ি আবার স্টার্ট দিলে। এবার সাধু গাড়ি চালাচ্ছে। পায়ে হেঁটে আগলু চলেছে উত্তরমুখো।

বুলেট চোখে বায়নোকুলার লাগিয়ে ওদের উপর নজর রাখছিল। বজ্রকে বললে, "তুমি এইখানে নেমে পড়। আগলু যাচ্ছে এখানে কোথায় 'বিবির বাগান' আছে সেইখানে। ওই বাগানের কিছু মিস্ত্রী আছে বলে মনে হয়। তুমি ওকে ফলো করো। কিন্তু সাবধান, নিজে

আর কিছু করবে না। আমরা যেমন ফলো করছি, করবো। তোমার কাজ হয়ে গেলে কলকাতায় ফিরে যেও। আমাদের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে না। সাধুরা যাচ্ছে বরাকরে, আমরাও সেখানে যাবো। আগলু যে এখানে নামবে, তা বর্ধমানে তাদের গোপন পরামর্শ থেকে জেনেছি। এখানে ওদের বিশেষ কি দরকার আছে। তাই আমার খুব সন্দেহ হচ্ছে।”

বজ্র তার ব্যাগটি নিয়ে নেমে যেতে বোমা আবার গাড়ি চালিয়ে দিলে।

বি. এল. বি. ৬৪৬৪ চলেছে এগিয়ে, আরও আরও এগিয়ে। বুলেটদের গাড়ি তাদের অনুসরণ করছে আগের মতোই দূরত্ব রেখে।

রানীগঞ্জ পার হয়ে কিছু দূর যাবার পর সাধু মাহাতোকে জিজ্ঞাসা করলে, “মাহাতো, তোমার সব ঠিক আছে তো ?”

মাহাতো উত্তর দিলে, “বিলকুল ঠিক আছে। তুমি ঘাবড়াইবে না। হামার দাওয়াইতে রোগরোগী দোনই খতম হোবে।” বড় বড় দাঁত বের করে মাহাতো হাসতে লাগলো।

সাধু বললে, “কিন্তু খুব সাবধানে সব করতে হবে। তড়িঘড়ির জরুরত নেই।”

মাহাতো বললে, “হাঁ হাঁ সে ঠিক হোবে। হামার দাওয়াই পেটে পড়লে বিশ-বাইশ দিন বেমারে ভুগবে। তারপর কুছ হোয় তো হোবে।”

সাধু বললে, “হাঁ, আমিও তাই চাই। খুড়ো এখন কিছু দিন উঠতে না পারলেই হলো। ও মতলব করেছে, এই সপ্তায় ওর বন্ধু এটর্নি মিত্তির সাহেবের সঙ্গে মূলাকাত করবে। তাহলে সব ভেস্তে যাবে।”

মাহাতো বললে, “না, তা হোতে দিবেক না। হামার এই দাওয়াইটা আজই ওকে পিলাই দিবে। কালসে উ খাটপর র যায়গা।”

বারেনকে এই দাওয়াই পিলাইয়েছি। উতো মুর্দা মাফিক পড়িয়ে থাকে।”

সাধু স্টীয়ারিং থেকে বাঁ হাত তুলে মাহাতোর পিঠ চাপড়ে বললে, “সাবাস্, কবিরাজ মশাই, সাবাস্!”

গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে সাধুদের গাড়ি চলেছে। বেলা প্রায় দুটো। আসানসোল টাউন হলের সামনে এসে বি. এল. বি. ৬৪৬৪ থেমে গেল। মাহাতো গাড়ি থেকে নেমে একটা খুব বড় স্টেশনারী দোকানের সামনে এসে দাঁড়াতেই একজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সাহেব এসে তার হাতে কি একটা জিনিস দিলে। মাহাতো গাড়িতে ফিরে এলো। সাধু গাড়ি ছেড়ে দিলে।

দূর থেকে বুলেট বায়নোকুলার দিয়ে দেখছে। তাদের গাড়িও চলতে শুরু করলো।

আসানসোল পার হয়ে গেল। বোমা বুলেটকে বললে, “বাংলা দেশ তো প্রায় শেষ হতে চললো।”

বুলেট বললে, “সাধুরা যাচ্ছে বরাকরে। বরাকর জায়গা বাংলার একেবারে শেষ সীমান্তে। ওখানে গেলে বুঝতে পারবে, চোখের সামনে দেখতেও পাবে ছোট ছোট পাহাড় নদী ঝরনা।”

আসানসোল থেকে বরাকর খুব বেশী দূর নয়। বি. এল. বি. ৬৪৬৪ বরাকর স্টেশনের সামনে পৌঁছলো। বেলা তখন প্রায় চারটে। সাধুদের গাড়ি কিন্তু এখানেও থামলো না, এগিয়ে চললো।

রেল লাইনের প্রায় সমান্তরাল একটা সরু রাস্তা। কিছু দূরে একটা মোড়, তারপর রাস্তাটা গেছে লাইনের তলা দিয়ে। এটা গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড না হলেও রানীগঞ্জ-কল্যাণেশ্বরীর বহু যাত্রীবাস-লরী এ পথে চলাচল করে।

ঐ রাস্তা ধরে সাধুদের গাড়ি খানিকটা এগিয়ে গেলে বুলেটের কথামতো বোমা বরাকর স্টেশনের সামনে গাড়ি থামালে। বুলেট বললে, “তুমি এইখানে থাকো। আমি আর বাঘ কল্যাণেশ্বরীতে

যাত্রীবাসে যাচ্ছি। সাধুরা শৈলেনবাবুর আশ্রমে যাচ্ছে। দু-এক দিন ওরা থাকবে সেখানে। আমিও যদি দরকার বুঝি ঐ আশ্রমে বা কাছাকাছি কোথাও থাকবো। কি রকম কি হয় পরে বাঘকে দিয়ে খবর দেব। সাধুদের ছেড়ে আমি আসবো না।”

বুলেট ও বাঘ ছুটে গিয়ে কল্যাণেশ্বরীর বাসে উঠলো।

বাঘ বুলেটকে বললে, “ওদের গাড়িখানা খুব এগিয়ে গেছে, আর দেখা যাচ্ছে না।”

বুলেট বললে, “সেজন্যে ভাবনা নেই, ওরা বরাবর শৈলেনবাবুর আশ্রমে যাচ্ছে। ওদের একটু এগিয়ে যেতে দিচ্ছি ইচ্ছা করেই। আমিও ঐ আশ্রমে যাব, কিন্তু সন্ধ্যার বেশী আগে নয়। কিছু ছদ্মবেশের ব্যবস্থা করতে হবে। তুমিও কল্যাণেশ্বরীর মন্দিরে থাকবে। অতবড় বিখ্যাত মন্দির—ওখানে নিশ্চয়ই যাত্রীবাস বা ধর্মশালা আছে। আমিও মন্দিরের আশপাশে কোন জায়গা থেকে পোশাক বদলে নেব।”

বাস এসে কল্যাণেশ্বরীর সামনে থামলো। বুলেট ও বাঘ নেমে পড়লো।

চারদিকে ছোট পাঁচিলঘেরা বাগান। বাগানের ঠিক মাঝখানে একটা একতলা ইঁটের বাড়ি ও মন্দির। ইঁটের বাড়িটা ঘিরে আট-দশখানা টালির ছাওয়া বড় বড় ঘর তৈরী হচ্ছে—এখনও শেষ হয় নি। গেটের সামনে ফুলের বাগান, তারপর সবুজ ঘাসে ঢাকা একটা ছোট মাঠ। সব দেখে মনে হয়, বাগানটা এককালে কোন সৌখীন ধনীর বাগানবাড়ি ছিল।

মাঠের মাঝখানে ঘাসের উপর অতি সৌম্য শান্তদর্শন এক প্রৌঢ় বসে আছেন। তাঁর সামনে সাধু ও মাহাতো বসে কথা কইছে। প্রৌঢ়টি শৈলেনবাবু।

সন্ধ্যা হতে বিশেষ দেরী নেই। কল্যাণেশ্বরীর মন্দিরে আরতি আরম্ভ হয়েছে।

একজন তরুণ বৈরাগী এসে শৈলেনবাবুকে খুব ভক্তিভরে পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে।

শৈলেনবাবু খুব ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, "নারায়ণ! নারায়ণ!"

বালকটির দিকে চেয়ে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন, "বাবা, কোথা থেকে আসছ? বসো এখানে।" হাত দিয়ে তিনি নিজের ডান দিকটা দেখিয়ে দিলেন।

বালকটি শৈলেনবাবুর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হাত জোড় করে বিনীতভাবে বললে, "আমি কানে কম শুনি। আপনি জোরে বলুন কি বলছেন।"

তরুণ কিশোরের সাজপোশাক বৈরাগীর মতো। সে বসতেই, শৈলেনবাবু এবার একটু জোরে বললেন, "কোথা থেকে আসছ, বাবা?"

কিশোর উত্তর দিলে, "আমি আসছি খড়দার বিষ্ণুপ্রিয়া আশ্রম থেকে।"

বিষ্ণুপ্রিয়া আশ্রমের কথা শুনে শৈলেনবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, "বিষ্ণুপ্রিয়া আশ্রম! শ্রীধর বাবাজী মশাই কেমন আছেন? তাঁর মঠের খবর কি বল তো, বাবা?"

বৈরাগী বললে, "বাবাজী মশাই ভাল আছেন। তাঁর ও মঠের অবস্থাও ভাল। আপনাদের মত সৎ ব্যক্তির দানে—"

বাধা দিয়ে শৈলেনবাবু বললেন, "গুরু! গুরু! আমি অতি সামান্য ব্যক্তি, আমি কি দান করবো! সবই প্রভুর ইচ্ছা। যাক তোমাকে পেয়ে খুব আনন্দ হলো। এই বয়সে ধর্মপথে এসেছ, অমন সৎ গুরু পেয়েছ—মহাভাগ্যবান তুমি। তা দু-এক দিন এখানে থেকে যাও, বাবা। সদালাপ করা যাবে। তা তোমার নামটি কি, বাবা?"

বৈরাগী বললে, "দাসানুদাস পরমানন্দ।"

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। একজন আশ্রমবাসী একটা বড় হারিকেন লণ্ঠন সেখানে রেখে গেল।

শৈলেনবাবু তাকে ডাকলেন, বললেন, "মণি ভাই, এই ছেলেটির খাওয়া থাকার ব্যবস্থা কোরো।" শৈলেনবাবু বুলেটকে দেখিয়ে দিলেন। লোকটি চলে গেল।

সাধু শৈলেনবাবুকে বললে, "কাকাবাবু, কবিরাজ মশাই আপনার শরীরটা একবার পরীক্ষা করবেন। ওঁকে বহু সাধ্যসাধনা করে কাশী থেকে ধরে এনেছি।"

শৈলেনবাবু বললেন, "ওসব আর কেন, মণ্টু? ডাক পড়লেই যেতে হবে। রোগ ভোগ থাকলে ভুগতেই হবে, বাবা।"

মণ্টু বললে, "তা হবে না, কাকাবাবু। আমার মুখ চেয়ে আপনাকে আরো কিছু দিন থেকে যেতে হবে। চিকিৎসা আপনাকে করতেই হবে। তাই কবিরাজ মশাইকে কত সাধ্যসাধনা করে এনেছি।"

শৈলেনবাবু নিরুপায়ভাবে বসে রইলেন।

কবিরাজ অর্থাৎ মাহাতো শৈলেনবাবুর বুক পিঠ চোখের পাতা বেশ গম্ভীরভাবে পরীক্ষা করে কিছুক্ষণ চিন্তিত থেকে বললে, "খারাপ আছে, লেকিন খুব খারাপ কুছ দেখছে না।"

শৈলেনবাবু বললেন, "আমার নিজের শরীরের জন্যে বিন্দুমাত্র চিন্তা করি নে, দেহ আর বেশী দিন বহনও করতে চাই নে। আমার কর্তব্যগুলি সেরে তাড়াতাড়ি সরতে পারলে হয়।"

মণ্টু উদ্বিগ্নভাবে বললে, "কিন্তু আমি তো আপনাকে ছাড়বো না। আমার মতো পাপীকে উদ্ধার একমাত্র আপনিই করতে পারবেন। আমি আপনার কাছে দীক্ষা নেব। তা না দিলে আপনার পা আমি ছাড়বো না, কাকাবাবু।"

মণ্টু সত্যসত্যই শৈলেনবাবুর পা ছুটি ছুহাতে জড়িয়ে ধরলে।

শৈলেনবাবু মণ্টুর হাত থেকে পা ছাড়িয়ে নিতে নিতে হাসিমুখে বললেন, "ছাড়্, পাগলা, পা ছাড়্। আমি তোকে কি দীক্ষা দেব! আমার মূলধন কতটা, কতটুকুরই বা অধিকারী আমি! অন্ধ কি অন্ধকে পথ দেখাতে পারে?"

মণ্টু বললে, "কোন কথা শুনবো না। আপনি যদি দীক্ষা না দেন তো এই আশ্রমেই আমি অনশনে আত্মহত্যা করবো।"

আশ্রমবাসী সেই লোকটি এসে শৈলেনবাবুর সামনে দাঁড়াতেই শৈলেনবাবু সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, "এইবার আমাকে উঠতে হবে, মন্দিরে যাবার সময় হয়েছে। কবিরাজ মশাই যখন দয়া করে এসেছেন, তখন দু-এক দিন এখানে থেকে যান। মণ্টু যখন ছাড়ছে না, তখন আপনার চিকিৎসাধীন থাকতেই হবে। কিছু মনে করবেন না, আমি উঠছি।"

শৈলেনবাবু মন্দিরের দিকে চলে গেলেন।

রাত অনেক। শৈলেনবাবুর আশ্রমের আরতি সাধনভজন বহুক্ষণ শেষ হয়েছে। চারিদিক স্তব্ধ নিঝুম। একটা ঘরে শুয়েছে মাহাতো আর সাধু বা মণ্টু, আর ঠিক তার পাশের ঘরে বুলেট বা দাসানুদাস পরমানন্দ। মাহাতোদের ঘরে একটা দেশী লণ্ঠন টিমটিম করে জ্বলছে। বুলেট তার ঘরের বাতি নিভিয়ে দিয়েছে।

মাহাতো চাপা গলায় বললে, "তারপর সুরেনবাবু, বুড্ডাকে কি রকম দাওয়াই দিব বলিয়ে। বুড্ডার কিন্তু তবিয়ত ভালা নেহি।"

সাধু বললে, "সামান্য ডোজের কিছু দাও। ওকে এখুনি শেষ করা আমার ইচ্ছে নয়, তাহলে নানা ফ্যাঁসাদ হতে পারে। দিন পনের-কুড়ি শুয়ে থাকলেই হলো। ইতিমধ্যে আমাদের সব কাজ হয়ে যাবে।"

মাহাতো বললে, "সেই মাফিকই দিবো, তবে বুড্ডা খাইবে তো?"

সাধু বললে, "আমি নিজের হাতে খাইয়ে দেব মহাভক্তিভরে। ঐ জন্যেই এখানে দিন দুই থাকবো।"

সাধু হাসতে লাগলো।

মাহাতো বললে, "আস্তে, সেই বাচ্ছা সাধুটা নগিজ আছে।"

সাধু বললে, "সে এতক্ষণে ঘুমুচ্ছে। তাছাড়া ও বদ্ধকালা, কিছুই শুনতে পাবে না।"

মাহাতো জিজ্ঞাসা করলে, "এদফে চীনাটা কুছ আফিং কি কোকেন দিইয়েছে?"

সাধু উত্তর দিলে, "যৎসামান্য। ও আবার সিঙ্গাপুরে গেছে ঐ জন্যে।"

মাহাতো বললে, "যাক সে লিয়ে আভি হামাদের মাথা ঘামাইলে চলিবেক না। মহলে কাম কেত্তো দূর?"

সাধু বললে, "প্রায় শেষ হয়েছে। মন্দিরের ভিতের নীচে একটা সিন্দুকের সন্ধান পাওয়া গেছে। আমরা গেলে সেটা বের করা হবে। ওখানে লছমন আছে। বড় নায়েবটাকে ফাঁদে ফেলেছি, একেবারে আমার আস্তানায় নিয়ে রেখেছি। কিন্তু আচ্ছা ঝানু বুড়ো, একেবারে দখ্‌নে শয়তান। একটা কথাও ওর পেট থেকে বের করা যাচ্ছে না। ওকেও দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।"

মাহাতো বললে, "উস্‌কো একদম খতম করনেসে ক্যা ডর?"

সাধু বললে, "দেখি শেষ চেষ্টা করে, যদি ওর কাছ থেকে কথা বের করতে পারি। কদিন ঠাণ্ডা গারদে থাকবার পর যদি নরম হয়, তাই ওকে শেষ করি নি, এখনও গুম করে রেখেছি।"

মাহাতো বললে, "গুম-করা আদমিকো যাদা দিন এক জায়গামে রাখা ভালা নেহি। উস্‌কোভি জঙ্গলী আস্তানামে চালান দে দো।"

সাধু বললে, "শীঘ্রই দোব। ও কথা আমারও মনে হয়েছিল।"

মাহাতো বললে, "কিন্তু বহুৎ হুঁশিয়ার! দু দু আদমীকো গুম করা হুয়া। উস্‌নেসে আপনা জন আছে, বন্ধু বেরেদার আছে, পুলিস ভি আছে।"

সাধু বললে, "আমার তো মনে হয় না, কিছু ভয় করার আছে। কারণ পুলিস বা বীরেনের বন্ধুবান্ধবদের ধারণা, ওকে কোন গুপ্ত ডাকাতের দল সরিয়েছে মোটা টাকা আদায়ের জন্যে। পুলিস সেই দিক দিয়ে অনুসন্ধান করছে। অন্য কেউ যে বীরেনকে গুম করতে

পারে, সে কথা ওদের মনেই ওঠে নি। সেই জন্যে মনে হয়, এক্ষেত্রে আমাদের বিপদের সম্ভাবনা কম।"

মাহাতো বললে, "হুঁ, আমাদের বহুৎ হুঁসিয়ার থাকিতে হোবে। আর আত্মরক্ষার ব্যবস্থা ভি কোরতে হোবে।"

সাধু বললে, "তাও কিছু কিছু আছে বৈকি। গেল হপ্তায় খিদিরপুরে এক সারেঙ্গের কাছ থেকে একটা ভাল জিনিস সংগ্রহ করেছি। দেখাচ্ছি।"

সাধু তার হোমিওপ্যাথিক ঔষধের হাত ব্যাগের তলা খুলে একটা পিস্তল বের করে মাহাতোর হাতে দিলে।

লণ্ঠনের আলো একটু বাড়িয়ে দিয়ে মাহাতো পিস্তলটা ভাল করে দেখতে দেখতে বললে, "আচ্ছা চিজ!"

সাধু বললে, "আসল কোল্টের পিস্তল—ফাইভ শট্, ডেথরেঞ্জ একশ' ইয়ার্ড! তবে বুলেট বেশী পাওয়া যায় নি—তিন ডজন মাত্র।"

মাহাতো বললে, "হামার তো এর চেয়ে আচ্ছা চিজ থা, উতো খোয়া গিয়া, থুমি তুমার রিভলভারটা দিবে বলিয়েসিলে। কি হইল?"

সাধু উত্তর দিলে, "আমার রিভলভারটা হাবু নস্করের কাছে আছে। তাকে বলেও রেখেছি তোমার কথা, তুমি ওর কাছ থেকে নিয়ে নিও।"

মাহাতো খুব খুশী হলো। সাধুকে সে পিস্তলটা ফিরিয়ে দিতে, সাধু তার ডাক্তারী ব্যাগের তলার বোতাম খুলে পিস্তলটা রাখলে।

মাহাতো বললে, "আচ্ছা কায়দা ভি করিয়েছো তো। যো জানে না, পিস্তলটাও বাহার করতে সেকবে না।"

সাধু হাসতে হাসতে বললে, "নিজেই করেছি।"

আশ্রমের দেওয়াল-ঘড়িতে বারোটা বাজলো।

সাধু ও মাহাতো খাটে শুয়ে কম্বল মুড়ি দিলে। বুলেটও জানালার কাছ থেকে সরে এসে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লো।

* * *

কাজোরা গ্রাম।

গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ও অণ্ডাল-উখরা রোডের চৌমাথা থেকে কিছু উত্তর-পশ্চিমে মিনিট দশ-বারোর পথ গেলেই কাজোরা গ্রাম বা কাজোরা বাজার। বাজার থেকে বের হলেই অনেকগুলি কোলিয়ারীর চানক দেখা যায়, তারপর মাঠ। মাঠের মধ্যে একটা বহুকালের প্রাচীন ভাঙা দেড়তলা বাড়ি। বাড়িটা উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। আশে পাশে কতকগুলো বড় বড় আমজামের গাছ ও ঝোপজঙ্গল আছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় না, ঐ বাড়িতে কোন লোক বাস করে।

আগলু আস্তে আস্তে সেই বাড়িটার সামনে এসে বার কতক চারদিক ভাল করে দেখে নিয়ে দরজার কড়া নাড়লে।

একটু পরেই দরজা খুলে গেল। খুলে দিলে একটা হিন্দুস্থানী বুড়ী। আগলু বাড়ির মধ্যে যেতেই আবার দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

বজ্র দূর থেকে সবই দেখলে। সেখান থেকে আরো একটু কাছে এসে একটা আমলকী গাছের আড়ালে সে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু বাড়িটার দরজা আর খুললো না।

বজ্র বহুক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করার পর মাঠের মধ্যে এসে একটা গাছের আড়ালে বসলে। লক্ষ্য তার সেই দরজার দিকে। একটা চৌদ্দ-পনেরো বছরের ছেলে কতকগুলো ছাগল নিয়ে সেইখান দিয়ে যাচ্ছিল। বজ্র তাকে কাছে ডেকে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলে, "কোথায় যাচ্ছ, হারু ? আমাকে চিনতে পারছো তো ?"

বিস্মিত হয়ে ছেলেটা বললে, "আমার নাম তো হারু নয়, আর আপনাকেও তো চিনতে পারছি নে।"

বজ্র বললে, "বল কি ! চিনতে পারছ না ? আচ্ছা, তোমার বাড়ি কোথায় ?"

ছেলেটি উত্তর দিলে, "কান্দ্রায়।"

বজ্র বললে, "তাই তোমাকে চেনা-চেনা লাগছে। তবে নামটা ভুল হয়ে গেছে। আমি ওদিকে প্রায়ই যাই। আচ্ছা, তুমি তো

এখানকার লোক, বলতে পার, ঐ ভাঙা বাড়িটায় কারা থাকে? ও বাড়িটা কার?"

আগলু যে ভাঙা বাড়িটায় ঢুকেছিল, সেই বাড়িটা বজ্র হাত দিয়ে দেখালে।

ছেলেটা বললে, "বাড়ি কার তা তো জানি নে,—লোকে বলে 'বিবির বাগান'। কিন্তু কোন দিন কোন বিবি বা সাহেবকে ও বাড়িতে দেখি নি। ওখানে থাকে একদল কানা-খোঁড়া ছেলেমেয়ে আর থাকে একটা পাগলা বাবু ঐ ওপরের ঘরে। আর থাকে জন দুই হিন্দুস্থানী বুড়ো বুড়ী। তারা এদের দেখে।"

বয়সের তুলনায় ছেলেটার কথাবার্তা বেশ পাকাপাকা—বজ্রের শুনতে বেশ আমোদ লাগে।

সে জিজ্ঞাসা করলে, "পাগলা বাবুর বয়েস কত? খুব বুড়ো?"

ছেলেটা বললে, "বুড়ো কেন হবে? তার বয়েস চব্বিশ-পঁচিশ হবে। তাকে হিন্দুস্থানীরা বের হতে দেয় না, সারা দিনরাত ঐ ঘরে শিকল বন্ধ করে রাখে। ও বাড়িতে কেউ গেলে হিন্দুস্থানীরা তাড়িয়ে দেয়। কাউকে ঢুকতে দেয় না। একবার আমার একটা ছাগল ঐ বাড়ির মধ্যে গিয়েছিল, তাকে আনতে গিয়ে সব দেখে এসেছি।"

ছেলেটার ছাগলগুলো এগিয়ে গিয়েছিল। সে 'হেই! হেই!' করতে করতে সেইদিকে ছুটে চলে গেল।

সন্ধ্যা প্রায় সাতটা। কাজোরা গ্রামের একটা মন্দির থেকে আরতির বাজনা শোনা যাচ্ছে। বজ্র খুব আস্তে আস্তে চারদিকে ভাল করে লক্ষ্য রেখে সেই দেড়তলা বাড়ির কাছে এসে কিছুক্ষণ পাঁচিলের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল। জনপ্রাণীর সাড়া নেই কোথাও।

বাড়িটা ছোট। তার চারদিকে প্রচুর ফাঁকা জায়গা ও বাগান। সবই উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। পাঁচিলের গা ঘেঁষে একটা বড় আম গাছ। গাছটার অনেকগুলো ডালপালা পাঁচিলের উপর দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকেছে।

বজ্র সাবধানে সেই গাছে উঠে একটা ডাল বেয়ে অতি সন্তর্পণে পাঁচিল ডিঙিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকলো।

পাঁচিলের মধ্যে দেড়তলা বাড়ি ছাড়া আরো কতকগুলি টিনের চালা। একটা বড় টিনের চালায় কতকগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। তাদের কারুর পা খোঁড়া, হাত ভাঙা, কেউ বা অন্ধ। কিন্তু সবারই পা বাঁধা। অনেকে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, কেউ কেউ ক্ষুধায় কাঁদছে। কদাকার একটা লোক হাতে ছড়ি নিয়ে তাদের সামনে বসে ঝিমুচ্ছে, আর মাঝে মাঝে চাবুকের ঘা মারছে। সব দেখে শুনে মনে হয় না, এই ছেলেমেয়েদের এখানে রাখা হয়েছে কোন সৎ উদ্দেশ্যে লালনপালনের জন্যে।

বজ্র শুনেছিল, একশ্রেণীর বদলোক আছে যারা অসাবধানী ছোট ছোট ছেলেমেয়ে চুরি করে নিয়ে গিয়ে এই রকম বিকলাঙ্গ ও অন্ধ করে তাদের দিয়ে ভিক্ষে করিয়ে টাকা রোজগার করে। এই ছেলেমেয়েদের দেখে বজ্রর ধারণা হলো, এদের অর্থাৎ মাহাতোদের ভিখারীর ব্যবসাও আছে।

বজ্র সেই চালার পিছন থেকে সরে এসে দেড়তলা বাড়িটার ঠিক নীচে এসে দাঁড়ালো। কোথাও কোন লোক নেই, কেবল একটা কুকুর এক ছাই গাদায় চুপ করে শুয়ে আছে। নিঝুম নিস্তব্ধ সব, কেবল উপরের ঘর থেকে মাঝে মাঝে কাশির শব্দ আসছে। কাশির শব্দ শুনে বজ্র বুঝলে, বীরেন রায় কাশছে। ঘরটির দিকে ভাল করে লক্ষ্য করতে বজ্র দেখতে পেলে, ঘরটির একটি জানালা খোলা, ঘরে একটা আলো জ্বলছে। জানালাটার গরাদ আছে।

বজ্র অন্ধকারে ব্যাগ থেকে একটা মোটা দড়ি বের করলে। দড়িটার এক প্রান্তে একটা লোহার বাঁকা হুক্ লাগানো। হুক্‌টা দেখতে অনেকটা বঁড়শির মতো।

বজ্র সেই জানালা লক্ষ্য করে দুবার দড়িটা ছুঁড়তেই হুক্‌টা একটা গরাদে শক্তভাবে আটকে গেল। দড়ির অপর প্রান্তটা একটা গাছের

ডালে বেঁধে বজ্র অতি সন্তর্পণে সেই দড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। জানালার সামনে গিয়ে দেখলে, বীরেন রায় চুপ করে শুয়ে আছে। তার মাথার কাছে একটা আলো জ্বলছে টিমটিম করে। তার হাত পা বাঁধা নেই, তবে ঘরের দরজায় কুলুপ লাগানো।

বজ্র চাপা গলায় ডাকলে, "বীরেন দা! বীরেন দা!"

দ্বিতীয় ডাকে বীরেন রায় চমকে উঠে জানালার দিকে চাইতেই বজ্র বললে, "আমি বজ্র!"

"বজ্র!" বীরেন রায় দারুণ বিস্ময়ে উঠে বসলেন।

বজ্র বললে, "চুপ চুপ! আস্তে কথা বল। বহু কষ্টে তোমার সন্ধান পেয়েছি। তোমাকে উদ্ধার করবোই। তুমি দড়ি বেয়ে নীচে নামতে পারবে?"

একটু ভেবে বীরেন রায় বললে, "না ভাই, পারবো না। শরীর খুব দুর্বল, তবে আমাকে কোনমতে যদি ধরে নামিয়ে দিতে পার তো তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারবো। কিন্তু ঘর থেকে বের হব কি করে? ঘরের দরজায় কুলুপ লাগানো, জানলাতেও গরাদ।"

বজ্র বললে, "গরাদ কাটবার অস্ত্র আমাব কাছে আছে, তোমাকে দিচ্ছি। কিন্তু খুব সাবধান। কোন শব্দ যেন না হয়। তুমি কাট। আমি নেমে গিয়ে নীচটা আবার ভাল করে দেখে আসছি।"

বজ্র বীরেন রায়ের হাতে একটা লোহা কাটা হ্যাক্‌স্ ব্লেড দিয়ে নেমে গেল।

বজ্র নীচে গিয়ে বুঝলে, দু-একজন লোক আছে বটে, তবে তারা অনেক দূরে—বোধহয় রান্না করছে; উঠনের মধ্যে সেই কুকুরটা বসে আছে অন্য দিকে চেয়ে।

বজ্র এবার উপরে উঠে দেখলে, জানালার গরাদ কাটা হয়ে গেছে; বীরেন রায়ও প্রস্তুত।

বজ্র বললে, "বীরেন দা, আমার কাঁধের ওপর চড় তুমি, তোমাকে বয়ে নীচে নামবো। বাড়িটা বেশী উঁচু নয়, নামতে বেশী কষ্ট

হবে না। কিন্তু খুব সাবধান! সব সময় আমাকে ভাল করে ধরে থেক।”

বীরেন রায় বজ্রর কাঁধে চড়ে নামতে লাগলেন। কিন্তু যা ভাবা যায়, অনেক সময় তা হয় না। অতি সাবধানে নামলেও তারা মাটিতে পা দিতেই একটু শব্দ হল, সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটা চিৎকার আরম্ভ করলে।

কুকুরের চিৎকার শুনে টর্চ-হাতে একজন হিন্দুস্থানী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল। চারদিকে টর্চের আলো ফেলতে, বজ্র ও বীরেন রায়কে সে দেখে ফেললে।

বজ্র ত্রস্তভাবে বললে, “বীরেন দা, যে দিকে পার ছুটতে থাক, পিছনের দরজা খুলে রেখেছি। আমার কথা ভেব না। হাতের কাছে ইঁট আছে, কোমরে ছোরাও আছে। তোমার শিষ্য আমি, একথা মনে রেখ। আমি পথ আটকাচ্ছি, ওরা তোমাকে ধরতে যাবে নিশ্চয়ই।”

দারুণ অন্ধকার। পিছনের দরজাটা অল্প অল্প দেখা যাচ্ছে। দুর্বল শরীর নিয়ে বীরেন রায় যথাসম্ভব জোরে সেই দিকে ছুটতে লাগলেন।

হিন্দুস্থানীটার একলা এগুতে সাহস নেই। সে চিৎকার করে কাকে যেন ডাকতে লাগলো। কুকুরটাও সমানে ঘেউ ঘেউ করছে। এক-একবার সে তেড়ে আসছে। বজ্র তার দিকে দু-তিনবার ইঁট ছুঁড়তেই আর সে এগিয়ে এল না, কিন্তু পিছিয়েও বেশীদূর গেল না।

হিন্দুস্থানীটার ডাকে আর একজন লোক ছুটে এল। ব্যাপারটা বুঝেই ঘরে ঢুকে সে একটা লাঠি নিয়ে এগিয়ে গেল বজ্রর দিকে।

বজ্র কিন্তু সরলো না। সে পথ আটকে আছে, বীরেন রায়কে পালাবার সুযোগ দিচ্ছে।

লোক দুজন আরো একটু এগিয়ে আসতেই বজ্র তাদের লক্ষ্য করে ইঁট ছুঁড়তে আরম্ভ করলো।

ইঁটের পর ইঁট সে ছুঁড়ছে। সাঁ সাঁ করে ইঁটগুলো ছুটছে বুলেটের মতো।
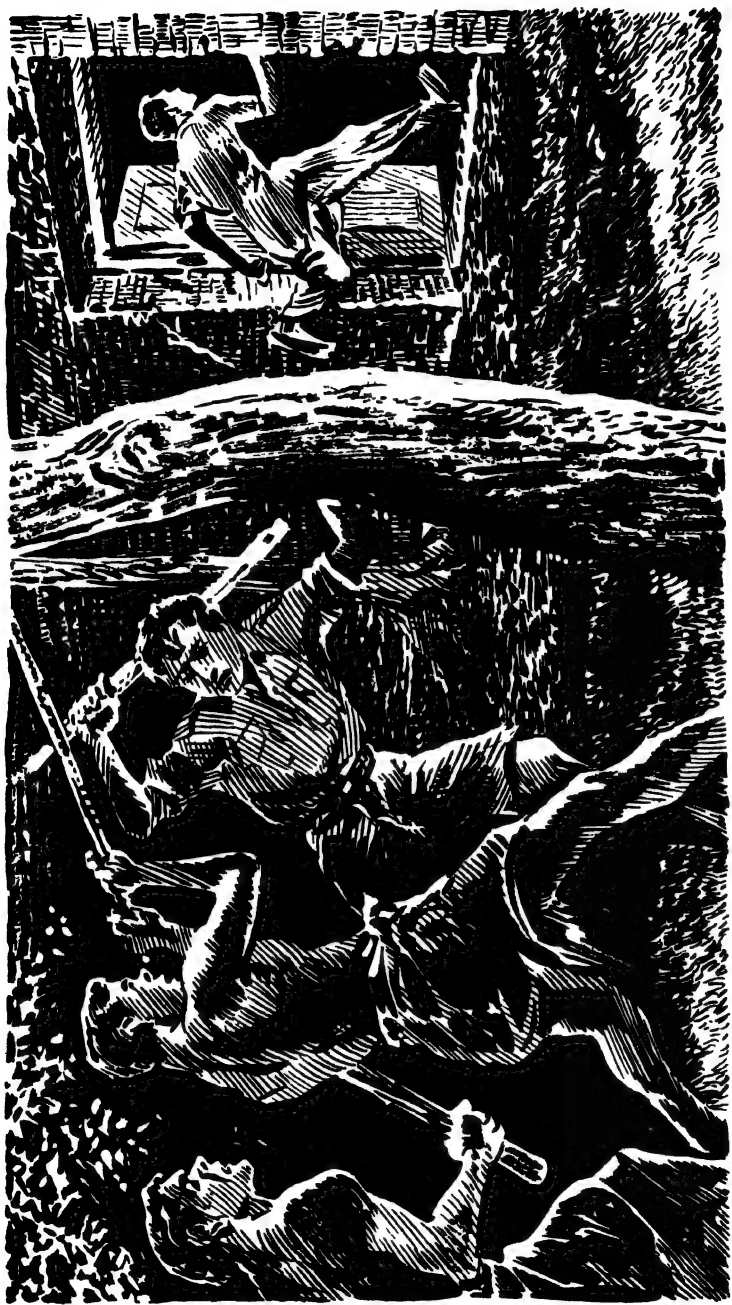
বজ্র তবুও পালাচ্ছে না। কাছে একটা হাত চাবেক

ওদের দলে আরো তুজন এসে যোগ দিল। তাদের হাতেও লাঠি। তাদেরও একজন ইঁট ছোঁড়া আরম্ভ করলে। বজ্র তবুও পালাচ্ছে না। কাছে একটা হাত চারেক লম্বা বাঁশ ছিল। সেটা নিয়ে সে ঘোরাতে লাগলো।

বজ্র লাঠি চালনায় দক্ষ। এ বিষয়ে তার নাম আছে যথেষ্ট। কিন্তু চারজনের বিরুদ্ধে একলা কতক্ষণ যুঝতে পাবা যায়! তবু সে দমছে না। বিপক্ষের ইঁট তার বাঁশের ঘায়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। তু-একটা যে গায়ে লাগছে না তাও নয়। তার কপাল কেটে গেছে, হাঁটু বেয়ে রক্ত ঝরছে। তবু সে পথ আটকে আছে। সমানে একলা লড়ছে চার জনের বিরুদ্ধে।

কিন্তু তুর্ভাগ্য! বাঁশটা ভেঙে গেল। ইঁটও ফুরিয়ে এসেছে। বজ্র লাফ মেরে পাঁচিল টপকে বাইরে আসতেই অন্ধকারে কে একজন তার মাথায় লাঠি মারলে। বজ্র যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে অন্ধকারের মাঝ দিয়েই ছুটতে লাগলো। তখনো সে এদিক-ওদিক লক্ষ্য করছে বীরেন রায়কে দেখার জন্যে! কিন্তু বৃথা চেষ্টা।

ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। একহাতও দৃষ্টি চলে না। বজ্র হঠাৎ একটা ডোবার মধ্যে গিয়ে পড়লো। ডোবা পুকুরটায় জল নেই—আছে কাদা।

বোধ হয় শেষ রাত। অল্প অল্প আলো দেখা দিয়েছে। কোলিয়ারীর দিক থেকে ঠং ঠং শব্দ আসছে—লিফট্ ওঠা নামার শব্দ। কুলীদের গলাও কানে আসে। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে তু-একখানা গাড়িও চলতে শুরু করেছে।

ধীরে ধীরে বজ্রর জ্ঞান ফিরে এল। সারা দেহ কাদায় ও রক্তে মাখা। কানের কাছে ঝিঁঝি পোকার ডাক। গায়ের ওপর ব্যাং লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। অসহ্য মশার কামড়। ঝাঁকে ঝাঁকে মশা উড়ছে। সারা দেহে দারুণ যন্ত্রণা, বিশেষ করে মাথায়। তবু মনে

তার পরম তৃপ্তি, বীরেনদাকে সে মুক্ত করতে পেরেছে। বজ্রর বিশ্বাস, বীরেনদা যদি কোনমতে বড় রাস্তায় বা কোন কোলিয়ারীর দিকে গিয়ে থাকেন, তাহলে এদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন।

তারও ভাগ্য ভাল বলতে হবে! এই ডোবার মধ্যে এসে পড়েছিল, তাই হিন্দুস্থানীরা দেখতে পায় নি।

ভোরের আলো আরো একটু স্পষ্ট হয়। বজ্র ডোবা থেকে উঠে অতি ধীরে ধীরে বড় রাস্তায় আসতেই তাব সামনে দিয়ে একটা মোটর গাড়ি সাঁ করে বেরিয়ে গেল।

মোটরটা চালাচ্ছে আগলু, তার পিছনের সীটে কে একজন শুয়ে আছে। তাঁর সারা দেহ মোটা কম্বলে জড়ানো—শুধু মুখখানা দেখা যাচ্ছে অল্প অল্প। তাকে দেখতে বজ্রর মনে হলো বীরেনদার মতো। রাস্তার উপর সে বসে পড়লো।

মাঝ রাত। সুপ্ত আশ্রম। মোটর গাড়ির ইলেক্‌ট্রিক হর্নের তীব্র শব্দে শৈলেনবাবুব ও আশ্রমের আর সবারই ঘুম ভেঙে গেল। শৈলেনবাবু একটা হারিকেন আলো নিয়ে তাঁর ঘব থেকে বেরিয়ে এলেন। একখানা মোটর গাড়ি এসে আশ্রমের বাগানের মধ্যে থেমেছে। গাড়ি থেকে একজন লোক তাঁর দিকে এগিয়ে এল। শৈলেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কে আপনি? কোথা থেকে আসছেন?"

লোকটি উত্তর দিলে, "আমি রানীগঞ্জ থেকে আসছি তারক ব্রহ্মচারীর কাছ থেকে। মহারাজের কলেরা হয়েছে, তাই কবরেজ মশাইকে নিয়ে যেতে এসেছি। কবরেজ মশাই এখানে আসবার পথে আমাদের মঠবাড়ি হয়ে এসেছিলেন। তাই জানি, তিনি এখানে আছেন।

রানীগঞ্জের তারক ব্রহ্মচারী একজন নামজাদা সাধুসজ্জন ব্যক্তি। শৈলেনবাবুর সঙ্গে তাঁর খুব হৃদ্যতাও আছে।

বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে শৈলেনবাবু বললেন, "এ্যাঁ? ব্রহ্মচারী মশায়ের কলেরা হয়েছে? কবিরাজ মশাই যাবেন বৈকি। নিশ্চয়ই যাবেন।"

মাহাতো ও সাধু অর্থাৎ মণ্টু ইতিমধ্যে উঠে পড়েছে। মণ্টু বললে, "কাকাবাবু, আদেশ করুন, আমিও কবরেজ মশায়ের সঙ্গে রানীগঞ্জে যাই, ব্রহ্মচারী মশায়ের সেবা করে ব্যর্থ জীবনে কিছু পুণ্য সঞ্চয় করি।"

শৈলেনবাবু সম্মতি দিলেন। আগন্তুকের গাড়িতে মাহাতো আর বি. এল. বি ৬৪৬৪-তে করে সাধু চলে গেল।

বুলেট তাব ঘরের মধ্য থেকে সব শুনছিল ও দেখছিল। সে বুঝলে, গুরুতর কোন ব্যাপার ঘটেছে।

অন্ধকারে পা টিপে টিপে সাধুদের ঘরে ঢুকে সে দেখলে, সাধু তার ব্যাগটা নিয়ে যেতে ভুল করে নি। সে ভেবেছিল, সাধুর পিস্তলটা সরিয়ে রাখবে। তা আর হলো না।

শৈলেনবাবু তাঁর ঘরে ফিরে যেতেই, বুলেট আশ্রম থেকে বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে কল্যাণেশ্বরীর মন্দিরেব সামনে এসে বার কয়েক জোরে জোরে হাততালি দিলে। নাটমন্দিব থেকে বাঘ দ্রুত বেরিয়ে এল, "কি ব্যাপার?"

বুলেট বললে, "পবে বলছি, চল বরাকর স্টেশনে। এখন কোন গাড়ি পাওয়া যাবে না। চল—ডবল মার্চ!"

বরাকর স্টেশনে একখানা ট্রেন আসছে জোরালো হেড লাইট্ জ্বেলে। স্টেশন মাস্টার ব্যস্ত হয়ে হাঁকাহাঁকি করছেন। প্লাটফরমে যাত্রীরা মুখর হয়ে উঠেছে। ঘুমভাঙা চোখে তারা হাঁকডাক আব ছুটোছুটি করছে মোটমাট আর সঙ্গীদের নিয়ে।

স্টেশনের সামনে মোটরে স্টীয়ারিং হুইলের ওপর মাথা রেখে বোমা বসে আছে। বুলেটের আকস্মিক ডাকে ধড়মড়িয়ে উঠে দেখলে, বুলেট ও বাঘ এসে তার পাশে দাঁড়িয়েছে। বুলেট তখনও তার

বৈরাগীর ছদ্মবেশ ছাড়তে পারে নি। ব্যস্তভাবে সে বললে, "এক্ষুনি গাড়ি ছাড়, বোমা।"

বুলেট ও বাঘ গাড়িতে উঠে বসলো।

বোমা গাড়ি স্টার্ট দিলে। বাঘ বললে, "যত পার স্পীড্ দাও, একেবারে টপ্ গীয়ারে চল।"

গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক বোডে পড়ে বোমা পুরো স্পীডে গাড়ি চালিয়ে দিলে।

সব কথা শুনে বোমা বললে, "আধ ঘণ্টার ওপর হলো বি. এল. বি. ৬৪৬৪ চলে গেছে। এখন কি আর তার নাগাল পাব!"

বুলেট সবসময় আশাবাদী। বললে, "দেখা যাক চেষ্টা করে, এই স্পীডে অণ্ডাল পর্যন্ত তো যাই।"

রোদ উঠেছে। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে লরি, বাস, প্রাইভেট গাড়ি চলতে শুরু করেছে। কোলিয়ারীর কুলীমজুররা যাতায়াত করছে। রাস্তার পাশে স্থানে স্থানে যাত্রীরা অপেক্ষা করছে বাসের জন্যে।

বুলেটরা অণ্ডালের চৌমাথায় এসে গেল।

বাঘ জিজ্ঞাসা করলে, "এখানে থামবো নাকি?"

বুলেট কাজোরা গ্রামেব দিকে চেয়ে ছিল, উত্তর দিলে, "একটু এগিয়ে গিয়ে থামবে।"

আধ মাইল প্রায় এগিয়ে গিয়ে অণ্ডাল গ্রামের কাছে বোমা গাড়ি থামালে। বুলেট বাঘকে বললে, "তুমি এখানে নাম। আজ সারা দিন কাজোরা গ্রামের আশেপাশে কাটাবে। একটা ছদ্মবেশ পরে নিও। ওখানে বোধহয় বজ্রকে দেখতে পাবে, না পেতেও পারো। তার জন্যে ভেব না। ওখানকার বাজারে দোকানে বা কুলীমজুরদের কাছে খবর নেবে, রাত্রে বিবির বাগানে কোন ঘটনা ঘটেছে কিনা। কোন কারণেই বেশী দেরী করবে না। আজই বিকালের ট্রেনে কলকাতায় ফিরবে।"

বাঘ নেবে যেতেই বোমার গাড়ি আবার চলতে শুরু করলে। একটা বাঁক ঘুরতেই বুলেট দেখলে, বজ্র রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

বোমা গাড়ি থামালে। সেও বজ্রকে দেখতে পেয়েছিল। বজ্র গাড়িতে উঠতেই আবার গাড়ি চলতে লাগলো।

বজ্র উঠেই জিজ্ঞাসা করলে, "বাঘকে দেখছি না তো! সে কোথায় ?"

বুলেট উত্তর দিলে, "চল, যেতে যেতে সব বলছি, তোমার কথাও সব শুনছি। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, বিশেষ কিছু ঘটেছে।"

বোমাকে বিশ্রাম দেবার জন্যে বুলেট এবার গাড়ি চালাতে লাগলো। বজ্র তার পাশে এসে বসলো।

ফাঁকা চওড়া রাস্তা। বুলেট টপ্ গীয়ারে গাড়ি চালাচ্ছে। গাড়ি চলছে হু হু করে। উঁচু নীচু রাস্তা, ঢেউ খেলানো। ছু পাশে গেরুয়া রংয়ের মাঠ—যুদ্ধের সময় মিলিটারী দখল করে নিয়েছিল। এখনও সেসব জমি অনাবাদী পতিত পড়ে আছে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হয়। বুলেট গাড়ি চালাচ্ছে অবিরাম। মিনিটে মিনিটে পার হয়ে যাচ্ছে বড় বড় মাঠ পল্লী। পার হয়ে গেল ছুর্গাপুরের জঙ্গল—পানাগড়—গলসী—বর্ধমান শহর—চন্দননগর—উত্তরপাড়া—বালি। ক্রমে হাওড়া এসে গেল। কিন্তু বি. এল. বি. ৬৪৬৪ কোথায়! তার কোন পাত্তাই নেই।

হাওড়া স্টেশনের কাছাকাছি এসে বুলেট বোমাকে বললে, "এইবার তুমি গাড়ি চালাও। তোমার ওনার্স লাইসেন্স আছে, আমার নেই। ট্রাফিক আইনও ভাল জানি নে। এখানকার ট্রাফিক পুলিসরা ভারী সতর্ক। আমাদের সকলেরই বয়স কম। সহজেই ওরা সন্দেহ করতে পারে, আমরা হয়তো বিনা লাইসেন্সে গাড়ি চালাচ্ছি।"

বোমা বললে, "ফলস্ গোঁফ, সান গ্লাস আর হ্যাট পরে বয়েস বাড়িয়ে নেওয়া যাক।" সে গাড়ি চালাতে আরম্ভ করলে।

হাওড়া ব্রীজের প্রায় শেষ প্রান্তে আসতেই বুলেট প্রায় লাফিয়ে উঠলো, "ছাখ, ছাখ—বি. এল. বি. ৬৪৬৪! স্ট্র্যাণ্ড রোড ধরে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে।"

বজ্র দূরবীন দিয়ে দেখছে। সামনের সীটে মাহাতো আর আগলু। আগলু গাড়ি চালাচ্ছে। পিছনের সীটে কি একটা কালো জিনিস অল্প দেখা গেল। মানুষ কি বিছানাপত্র তা বুঝতে পারার আগেই বি. এল. বি. ৬৪৬৪ বাস ট্রাম ও জনতার মধ্যে মিলিয়ে গেল। তবে গাড়িটা যে সোজা দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে, তা বুঝা যায়।

বুলেটদের গাড়ি হাওড়া ব্রীজ পার হয়ে স্ট্রাণ্ড রোডে পড়লো। বুলেট বললে, "বি. এল. বি. ৬৪৬৪ যাচ্ছে বোধহয় পৈলানে। তারপর ডায়মণ্ড হারবার হয়ে কাকদ্বীপেও যেতে পারে। তোমরা ফলো করো যতদূর পার। আমি এইখানে নেমে লালবাজার পুলিস হেড কোয়ার্টারে জানাই, ওরা যদি বেহালা থেকে গাড়িটা আটক করতে পারে।"

বুলেট গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে একটা ট্যাক্সিতে উঠলো। বোমার গাড়ি স্ট্রাণ্ড রোড ধরে চললো দক্ষিণ দিকে।

কলকাতায় এখন অফিস টাইম্। অফিস অঞ্চলের সব রাস্তায় লোকজন বাস ট্রাম প্রাইভেট গাড়ির মিছিল। এ সময় ভীড় হয় অসম্ভব। তার উপর আছে পদে পদে ট্রাফিক পুলিসের বা সিগন্যালের বাধা। সেসবের মধ্য দিয়ে দ্রুত গাড়ি চালানো অসম্ভব বলা চলে। বোমা তবু বেশ জোরেই চলেছে। বজ্র দূরবীন নিয়ে লক্ষ্য রেখেছে বি. এল. বি. ৬৪৬৪-এর উপর। এখনও এক-একবার দেখা যাচ্ছে গাড়িখানা, আবার ভীড়ের মধ্যে মিশে যাচ্ছে।

পনেরো মিনিটের মধ্যে লালবাজার থেকে বেহালা থানার ও সি. বা ইন্স্পেক্টারকে জানানো হলো, "বি. এল. বি. ৬৪৬৪ নম্বরের একখানা টুরিং বডি গাড়ি ডায়মণ্ড হারবার রোড ধরে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে। ঐ গাড়িতে কয়েকজন ডেন্জারাস টাইপের ক্রিমিনাল আছে; সঙ্গে একজন কিড্ন্যাপ-করা রুগ্ন যুবকও থাকতে পারে। গাড়িখানা দেখলেই আটকাবেন। ওদের কাছে পিস্তল আছে। আত্মরক্ষার ব্যাপারে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে কাজ করবেন।"

বুলেট লালবাজার কণ্ট্রোল রুমের সামনের বারান্দায় অধীরভাবে পায়চারি করতে করতে, প্রত্যেক সেকেণ্ড-মিনিট গুণছে। ঘরের মধ্যে একজন পুলিস অফিসার বসে আছেন। অফিসার এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সাহেব। ঘটনাটা তিনি সবই শুনেছেন। তিনিও ফোনের অপেক্ষা করছেন আর মাঝে মাঝে পাইপ টানছেন।

প্রায় মিনিট পনেরো পরে বেহালা থানা থেকে খবর এল, "লালবাজার থেকে ফোন পাবার মিনিট খানেক আগে ঐ গাড়িখানা বেহালা থানা পার হয়ে সোজা দক্ষিণ দিকে গেছে। পুলিস-ট্রাক পাঠানো হয়েছে ফলো করবার জন্যে। দরকার হয়তো ডায়মণ্ড হারবার পর্যন্ত ট্রাক যাবে। বিষ্ণুপুরের থানার ও. সি.-কেও জানাচ্ছি।"

আর ফলো !—বুলেট খুবই আশা করেছিল বেহালায় বি এল বি. ৬৪৬৪ আটক পড়বে। তা হলো না। এরপর ডায়মণ্ড হারবার রোডের মত ফাঁকা নির্জন রাস্তায় ও গাড়িকে এত দেরির পর ফলো করে ধরাটা যে কতখানি অসম্ভব ব্যাপার, বুলেট তা বোঝে। তাই স্বগতভাবে বললে, 'আর ফলো !'

তবে এখনও সে দমে নি। তার সবচেয়ে বড় গুণ, সহজে সে দমে না বা ক্লান্ত হয়ে পড়ে না, ব্যর্থ হলে তার কর্মশক্তি আরও যেন বেড়ে যায়।

বুলেট রাস্তায় বেরিয়ে একটা ফাঁকা চলৃতি ট্যাক্সিতে উঠলে। ড্রাইভারকে বললে, "চল, বেহালা।"

অফিস কোয়ার্টারে এখনও গাড়ি বা লোকজনের ভীড় কমে নি, বিশেষত বড় বড় রাস্তায়, তাই বড় রাস্তা ছেড়ে গলির পথ দিয়ে এই অঞ্চলটা পার হয়ে ট্যাক্সি গড়ের মাঠের কাছে এসে রেড রোড ধরলে।

আলিপুর পার হয়ে দুর্গানগর পোলের কাছে আসতেই বুলেট ট্যাক্সি থেকে দেখতে পেলে, বোমার গাড়ি রাস্তার ধারে একটা পেট্রোল পাম্পের সামনে রয়েছে। বজ্র তাতে পেট্রোল ভরাচ্ছে। বুলেট ট্যাক্সি ছেড়ে দিলে।

বোমা বললে, "মোমিনপুর আসতেই বি. এল, বি. ৬৪৬৪-কে স্পষ্ট দেখতে পেলুম। ফলো করে যেমনি এই পোলটা পার হয়েছি, অমনি আমাদের গাড়ি থেমে গেল। কিন্তু হিসাব মতো পেট্রোল ফুরোবার কথা নয়।"

বোমা খুব লজ্জিত হয়েছে।

পেট্রোল নেওয়া শেষ হলে বুলেট বোমাকে বললে, "চল একবার বেহালা থানায় যাই। দেখি ওরা আর কোন নতুন খবর দিতে পারে কি না।"

প্রায় এক ঘণ্টা বেহালা থানায় অপেক্ষা করবার পর বেহালার পুলিস ট্রাক ফিরে এসে রিপোর্ট দিলে—তারা ডায়মণ্ড হারবার রোড ধরে বহুদূর পর্যন্ত গিয়েছিল ; কিন্তু বি. এল. বি. ৬৪৬৪ নম্বরের কোন গাড়ি দেখতে পায় নি। তবে বিষ্ণুপুর থানার একজন কন্স্টেবল বলেছে, একখানা গাড়ি কয়েক মিনিটের জন্যে সে পৈলান বাজারের সামনে থামা অবস্থায় দেখেছে। গাড়ির সামনে দুজন লোক, আর পিছনের সীটে একজন লোক, বোধহয় রোগী, কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে, দেখেছে। সে পৈলান হাটে নিজের দরকারে গিয়েছিল মিনিট দশেকের জন্যে, ফিরে এসে গাড়িটাকে আর দেখতে পায় নি, গাড়িটা কোন্ দিকে গেছে, তা বলতে পারে না।

বেহালা থানার ও. সি লালবাজার পুলিসকে সব জানালে। তারা কি বললে জানা গেল না।

বুলেটরা যখন ভবানীপুরে ফিরলো, তখন রাত আটটা। সকলেই কিছুটা বিমর্ষ—অবশ্য বুলেট ছাড়া। সে বললে, "এবারের যাত্রায় আমরা পুরোপুরি সফল হই নি বটে, কিন্তু আসল সূত্র দেখতে পেয়েছি। যেভাবে আমরা পরিশ্রম করছি, এইভাবে করলে নিশ্চয়ই সফল হবো।"

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

'শক্তি-সংঘ'-এর জরুরী অতি-গোপনীয় সভা বসেছে। সভার প্রশস্ত মিটিং-হলে সভ্যরা ছাড়া কেউ নেই—এমন কি সংঘের চাকর-মালিদেরও প্রবেশ নিষেধ। হলের চারদিকের দরজা-জানালা বন্ধ। সবাই গম্ভীর। পুরুষ সভ্যদের সকলের মিলিটারী ও মেয়েদের গার্ল-গাইডের পোশাক।

হলের এক প্রান্তে একটা ছোট প্লাটফরমের উপর শক্তি-সংঘের ক্যাপ্টেন বুলেট দাঁড়িয়ে আছে। তার সামনের পর পর ক'টা বেঞ্চিতে বসে আছে সংঘের মেয়ে সভ্যারা—লক্ষ্মীবাই, হায়েনা, ভোজালী, ভীমা প্রভৃতি ; তারপরে রয়েছে ছেলেরা—বজ্র, বোমা, বাঘ, বেয়নেট, বর্শা, বোল্ট, ব্যাটন এবং আরও অনেকে।

হল-ঘর নিঝুম স্তব্ধ—সূঁচ পড়লেও বোধহয় শোনা যায়। সবাই ক্যাপ্টেনের দিকে চেয়ে আছে।

বুলেট ধীর দৃঢ় কণ্ঠে বলতে আরম্ভ করলে, "শক্তি-সংঘের ভাই ও বোনেরা, এইবার আমাদের আসল অভিযান বা প্রচেষ্টা শুরু হবে। আমাদের শ্রদ্ধেয় বীরেনদাকে উদ্ধার আমরা করবোই। এর জন্যে

আমরা এমন কি সহজে পুলিসেরও সাহায্য নেব না। আর আমাদের এই প্রচেষ্টার কথা শেষ পর্যন্ত আমরা সম্পূর্ণ গোপনীয় রাখবো। অবশ্য প্রয়োজন হলে আমরা নিজেদের অভিভাবকদের জানাতে পারি। আমার মনে হয়, আমাদের কোন অভিভাবকই এই কাজে অমত করবেন না। তাঁরা সকলেই বীরেনদাকে জানেন আর আমাদের সংঘের ছেলেমেয়েরা কেমন, তারও খবর রাখেন। তাঁদের মধ্যে একজনকে আমাদের অবশ্যই জানাতে হবে, তিনি হলেন অমিতাভ সেন। তিনি এক হপ্তা পরে কলকাতায় ফিরবেন। কিন্তু তাঁর জন্যে আমরা অপেক্ষা করতে পারবো না। ইতিমধ্যেই আমাদের বহু বিলম্ব হয়ে গেছে। এ কাজে বহু বাধাবিঘ্ন বিপদ পদে পদে আসবে, এমন কি প্রাণহানিরও সম্ভাবনা আছে। আমরা যাদের বিরুদ্ধে লড়তে যাচ্ছি, তারা খুবই শক্তিশালী ও দুর্ধর্ষ প্রকৃতির লোক ; আর আমাদের এই যাত্রার কর্মক্ষেত্র হলো সুন্দরবন। আমার মনে হয়, বীরেনদা দুর্গম সুন্দরবনের কোন গুপ্ত স্থানে অসহ্য নির্যাতন ভোগ করছেন, যেকোন মুহূর্তে নিহত হতে পারেন। সুন্দরবনের পরিচয় সবাই জান— যেখানে জলে ভয়ঙ্কর কুমীর-হাঙ্গর, ডাঙায় গহন বন—হিংস্র বাঘ বরা বিষাক্ত সাপ সে বনের বাসিন্দা। আমাদের লড়তে হবে এইসব সাপ বাঘদের চেয়েও হিংস্র একদল লোকের সঙ্গে। মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রও আছে তাদের সঙ্গে। এইসব জেনেও আমরা সেখানে যেতে চাই। এ বিষয়ে কারো যদি কিছু বলবার থাকে তো বল, আর কে কে এই অভিযানে সেই দুর্গম ভয়ঙ্কর জায়গায় যেতে চাও তাও বল ?”

বুলেটের বক্তৃতা শেষ হতেই, সব ছেলেমেয়েরা উঠে দাঁড়ালো,— অর্থাৎ সম্মতি জানালে সকলেই।

বুলেটের মুখে হাসি দেখা দিল। খুশির স্বরে সে বললে, “এই তো চাই। তবে আমাদের প্রথম যাত্রায় সকলের দরকার হবে না। আমার সঙ্গে যাবে বজ্র, বোমা, বাঘ, বেয়নেট, বর্শা, বোল্ট আর ব্যাটন। আর একজনকে আমরা ঘটনাস্থলেই পাবো। সে যদিও আমাদের সংঘের

সভ্য নয়, তবুও তার সঙ্গে আমার ও বজ্রের খুব জানাশুনা আছে। সে আমাদের দুজনের সহকর্মী ছিল 'সুন্দরবনের গুপ্তধন' উদ্ধারের সময়। ছেলেটি ঐ অঞ্চলেরই বাসিন্দা। তাকে দিয়ে আমরা অনেক কাজ পাব। মেয়ে সভ্যাদের সেখানে যেতে হবে না। এইখানে তাদের ওপর বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কাজ দেব। প্রথমেই সে কাজের কথা বলি। আমরা প্রায় সবাই এখন কলকাতার বাইরে যাচ্ছি আমার অবর্তমানে লক্ষ্মীবাই এই সংঘের ক্যাপ্টেন হোক, এই প্রস্তাব আমি করছি।"

সকল মেম্বারই সানন্দে প্রস্তাব অনুমোদন করলে।

বুলেট মেয়ে সভ্যাদের উদ্দেশে বললে, "আগামী কাল লক্ষ্মীবাই, ভীমা, ভোজালী, হায়েনা—এই চারজনে একটা কাজ করবে। কাজটা যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি খুব বিপদের সম্ভাবনাও আছে। তবে আমি এই চারজনের বুদ্ধি, ক্ষমতা ও সাহসিকতার উপর বিশ্বাস ও আস্থা রাখি, তাই এই কাজের ভার তাদের উপর দিচ্ছি।"

লক্ষ্মীবাই, ভোজালী, ভীমা ও হায়েনা বুলেটের সামনে এসে মিলিটারী স্যালুট করে দাঁড়ালো।

বুলেট তাদের বলতে লাগলো, "পৈলান জায়গাটা কোথায়, তা তোমরা আমাদের কাছে কাল শুনেছ। ওখানে হাবু নস্করের বাড়িটা কোথায়, তা বজ্র তোমাদের ম্যাপ এঁকে বুঝিয়ে দেবে। তোমরা কাল বিকেল চারটার সময় হাবু নস্করের বাড়ি গিয়ে কতকগুলি জিনিসের খোঁজ নেবে। হাবু নস্কর লোকটা আমাদের বিরুদ্ধ দলের। সে এখন বাড়িতে নেই, কালও থাকবে না। হাবু নস্করের বাড়ি গিয়ে তার বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে তোমরা খুব আলাপ জমাবে, আর সেই সুযোগে ওদের বাড়ির ঘরগুলো ভাল করে খুঁজে দেখবে। লক্ষ্য করবে, বীরেনদাকে ওখানে লুকিয়ে রেখেছে কিনা। বীরেনদাকে সুন্দরবনে না পাঠিয়ে ওখানে রাখতে পারে, সে সম্ভাবনাও আছে। বজ্র ও বোমা মোটরে করে তোমাদের পৈলানে নিয়ে যাবে। তারা পৈলানের

কাছে একটা বড় বাগানের সামনে তোমাদের নামিয়ে দিয়ে ডায়মণ্ড হারবার রোডের উপর গাড়িতে অপেক্ষা করবে। তোমরা যে বাগানটার সামনে নামবে, তার নাম 'চিরন্তনী'। ওই বাগানের মাঝ দিয়ে তোমরা হাবু নস্করের বাড়ি যাবে ও আসবে। তোমাদের আত্মরক্ষা করার মতো সব জিনিসই ব্যাগে ভরে দিচ্ছি। সঙ্গে হুইসিলও দিচ্ছি। যদি কোন বিপদে পড়, নিজেরা নিজেদের রক্ষা করার চেষ্টা করবে। একান্ত অপরাগ হলে হুইসিল বাজাবে, বজ্র ও বোমা সতর্ক থাকবে।"

মেয়ে সভ্যারা স্থিরভাবে সব কথা শুনলে। বুলেটের কথা মতো বজ্র চারটে ছোট ছোট ব্যাগ এনে তাদের দিলে ; তারা কাঁধে ঝুলিয়ে নিলে। গার্লগাইডের পোশাকের সঙ্গে খাকী রংয়ের ব্যাগগুলো বেশ মানিয়ে গেল।

বুলেট বললে, "রাত প্রায় নটা, মেয়ে সভ্যারা এইবার যেতে পার।"

সংঘের মেয়েদের মধ্যে লক্ষ্মীবাই, ভোজালী, ভীমা ও হায়েনা—এই চারজন সব বিষয় দক্ষ। স্বাস্থ্যও তাদের অতি সুন্দর। লাঠি বা ছোরা খেলায় এমন কি বক্সিং-এও এদের নাম আছে।

লক্ষ্মীবাইয়ের দল বুলেটকে স্যালুট করে চলে গেল।

বুলেট আবার বলতে লাগলো, "আমরা যে অঞ্চলে যাব ঠিক করেছি, তার পরিচয় তো দিলুম। সেদিকে আমাদের মতো চেহারার বিদেশী একদল কমবয়সের ছেলে গেলেই সেখানকার লোকেরা আমাদের সন্দেহের চোখে দেখবে। আমরা ও দিকে কি উদ্দেশ্যে এসেছি, সে বিষয়ে তাদের কৌতূহল হবে। অথচ সব সময় কোন ছদ্মবেশ পরে থাকাও সম্ভব নয়। আমাদের বেশ কিছু দিন সেখানে থাকতে হবে। সেইজন্যে অন্য রকম ছদ্মবেশ ধরতে হবে, কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদে নয়। ওখানে গিয়ে আমাদের প্রচার করতে হবে—আমরা পল্লীবাসীদের উপকারের জন্যে স্বেচ্ছাসেবক হয়ে তাদের দেশে গেছি। এই ছলনাটা আমাদের করতে হবে। সৎ কাজে ও

যুদ্ধেতে এ জাতীয় ছলনা দূষণীয় নয়। এ কাজে যা দরকার, আমি ও বজ্র সবই ব্যবস্থা করে রাখবো। আত্মরক্ষার সব জিনিসেরই ব্যবস্থা থাকবে। আমরা কাল বাদে পরশু ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় সকলে এখানে এসে মিলিত হয়ে যাত্রা করবো। এই স্থির রইল।"

বুলেট থামলে। সভা ভঙ্গ হলো।

কলকাতা থেকে প্রায় দশ মাইল দক্ষিণে ডায়মণ্ড হারবার রোডের উপর ম্যাকলিয়ড কোম্পানীর একটা ছোট রেলওয়ে স্টেশন। স্টেশনটার নাম 'পৈলান'। তার একটু আগে পৈলান বাজার এখান থেকে পৈলান গ্রাম কাছেই।

পৈলানের হাবু নস্করের বাড়িতে একটি বার-তের বছরের মেয়ে উঠোনে বসে কি কাজ করছে। এমন সময় স্কুলটিউনিক্স ও জুতামোজা-পরা চারজন ভদ্রঘরের বড় বড় মেয়েকে ওদের বাড়ির দিকে আসতে দেখে সে উঠে দাঁড়ালো। তার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি লক্ষ্য করে লক্ষ্মীবাই বললে, "বেড়াতে এসেছি।"

মেয়েটি বললে, "ওঃ! বোধহয় 'বিজয়ভূমি' কি 'চিরন্তনী' বাগান থেকে আসছো? মাঝে মাঝে আমাদের এদিকে বাবুদের মেয়েরা আসে আমাদের গাঁ দেখতে।"

লক্ষ্মীবাই উত্তর দিলে, "হাঁ, ঐ দিক থেকেই আসছি। তোমাদের গ্রামখানা বেশ। তোমার নাম কি?"

"সত্যভামা।"

সত্যভামা ছাড়া বাড়িতে অন্য কেউ নেই, এমন কি তার মাও নেই। সত্যভামা ঘরের দাওয়ায় একখানা চাটাই পেতে আগন্তুক মেয়েদের বসতে দিলে।

ভোজালী ও ভীমা বসে সত্যভামার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিলে। লক্ষ্মীবাই ও হায়েনা ওদিকে সারা বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখছে—শোবার ঘর, গোয়ালঘর, ঢেঁকিশালা, রান্নাঘর, চণ্ডীমণ্ডপ, ধানের মরাই।

ভীমা সত্যভামাকে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমাদের বাড়ির আর কাউকে তো দেখছি না, তোমার বাবা মা আর সব কোথায় ?"

সত্যভামা উত্তর দিলে, "মা আর আমার ছোট ভাই বিষ্ণুপুরে মেলা দেখতে গেছে। এইবার আসবে। আর বাবা গেছে জমিদারবাবুদের লাটে—সেই সুন্দরবনে।"

খুব বিস্ময়ের সুরে ভীমা বললে, "সুন্দরবনে! ও বাব্বা! সেখানে তো বড় বড় বাঘ থাকে! সেখানে তোমার বাবা কেমন করে গেল ?"

সত্যভামা বললে, "বাবুদের মোটরগাড়ি এসেছিল। বাবা তাতে করে যাবে কাকদ্বীপ, সেখান থেকে সুন্দরবনে যাবে নৌকোয়। কিছু-দিন পরে কাকাও আবার সেখানে যাবে। বাবা কি জিনিস ফেলে গেছে, তাই নিতে আসবে।"

ভীমা জিজ্ঞাসা করলে, "বাঘের রাজ্যে তোমার বাবা গেছে, আবার তোমার কাকাও যাবে! তোমার কাকাকে তো দেখছি না ?"

সত্যভামা উত্তর দিলে, "সে এ বাড়িতে থাকে না। আমার ঠিক কাকা সে নয়, জাতে হিন্দুস্থানী—আমায় খুব ভালবাসে। আমি তাকে কাকা বলে ডাকি।"

ভীমা বললে, "ওঃ! তাই এখানে থাকে না! আচ্ছা, সুন্দরবনে বাঘের রাজ্যে তোমার কাকা কি জিনিস নিয়ে যাবে ?"

সত্যভামা বললে, "কি জিনিস, তা আমি কি জানি—মা জানে। মেলায় যাবার আগে মা আমাকে বলে গেছে, কাকা বা তার কোন লোক যদি একটা জিনিস চাইতে আসে তো শোবার ঘরের কুলুঙ্গিতে তোয়ালে জড়ানো যে জিনিসটা আছে, তাকে দিবি।"

লক্ষ্মীবাই বাড়ির মধ্যে ঘুরছিল আর এদের আলাপ-আলোচনাও শুনছিল। সে ভীমাকে একটা ইশারা করে সন্তর্পণে ঘরে ঢুকে কুলুঙ্গির উপর থেকে তোয়ালে জড়ানো জিনিসটা নিয়ে খপ্ করে নিজের ব্যাগের মধ্যে পুরলে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে সত্যভামার মা বাড়ি ঢুকলে। চারজন অচেনা মেয়েকে তাদের বাড়ির মধ্যে দেখেই সে বলে উঠলো, "কে? কে তোমরা? বলা নেই কওয়া নেই, লোকের ঘরের মধ্যে ঢুকেছ! কোথা থেকে আসছো তোমরা?"

সত্যভামা বললে, "ওরা বিজয়ভূমি থেকে—"

বাধা দিয়ে সত্যভামার মা রেগে বললে, "তুই থাম্! তুই কি বুঝিস্? বাবু বলে গেছে খুব সাবধানে থাকতে, পেছনে লোক লেগেছে। এরা যে সেই সব বদমাইস লোকদের চর নয়, কে বলতে পারে!"

লক্ষ্মীবাই খুব রাগ দেখিয়ে বললে, "কি যা তা আমাদের বলছেন? আমরা শহরে থাকি, পাড়াগাঁ কখনো দেখি নি। তাই আপনাদের এদিকে এসেছিলুম—।"

বাধা দিয়ে চড়া গলায় সত্যভামার মা বললে, "আমার মাথা কিনেছ! তা এসেছ পাড়াগাঁ দেখতে, পাড়াগাঁ দেখবে! আমাদের ঘরের মধ্যে ঢুকেছ কি মতলবে?"

খুব যেন রেগে লক্ষ্মীবাই বললে, "আপনি কি আমাদের চোর বলে সন্দেহ করেন? ছিঃ ছিঃ! এই মুহূর্তেই আপনাদের বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছি।"

লক্ষ্মীবাই ঘরের দাওয়া থেকে লাফিয়ে নীচে নেমে সঙ্গীদের বললে, "তোমরা চলে এসো এক্ষুনি।"

হাবু নস্করের শোবার ঘর থেকে তোয়ালে জড়ানো যে প্যাকেটটা লক্ষ্মীবাই নিয়ে ব্যাগের মধ্যে পুরেছিল, সেটা সম্পূর্ণ ঢুকলেও তোয়ালের একটু অংশ ব্যাগ থেকে বের হয়েছিল।

সত্যভামার মায়ের সন্ধানী চোখে তা পড়তেই সে ছুটে এসে খপ্ করে লক্ষীবাইয়ের একটা হাত চেপে ধরে চিৎকার করে বললে, "কি তোমার ঝোলায়? খোল দেখি! এতক্ষণ তো খুব মুখ সাফাই করছিলে! খোল, নইলে এক্ষুনি চেঁচিয়ে গাঁয়ের লোক সব জড়ো

করবো, টানতে টানতে পুলিসে দিয়ে আসবো—আমার ঘরের জিনিস চুরি করেছ বলে।"

লক্ষ্মীবাই দেখলে, একেবার হাতে নাতে ধরা পড়েছে ; এখন আর উপায় নেই—আসল মূর্তি ধরতে হবেই। সে চাপা গলায় বললে, "বি রেডি সিস্‌টারস্‌ উইথ ড্যাগার্স।"

মুহূর্ত মধ্যে চারখানা ঝকঝকে ধারালো ছোরা বের করে চারজনে সত্যভামার মাকে ঘিরে ফেললে। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সত্যভামার মা লক্ষ্মীবাইয়ের হাত ছেড়ে দিলে। সত্যভামা কাঁদবার উপক্রম করতেই লক্ষ্মীবাই তার বুকের উপর ছোরাটা ধরে ধমক দিয়ে বললে, "চুপ! একেবারে চুপ! টু শব্দ করলে, হাতে কি আছে দেখছো তো?"

সত্যভামা আর তার মার মুখ দিয়ে কথা সরলে না। থরথর করে তারা কাঁপছে। আদেশের স্বরে লক্ষ্মীবাই বললে, "দুজনে এই মুহূর্তে তোমাদের ঘরের মধ্যে ঢোক—ওয়ান—টু—"

সত্যভামা ও তার মা দ্রুতপদে ঘরে ঢুকতেই লক্ষ্মীবাই ঘরের শিকল তুলে দিয়েই বললে, "কুইক মার্চ সিস্‌টারস্‌!"

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তারা অদৃশ্য হয়ে গেল।

পৈলান গ্রামে মেয়ে ডাকাতদের কথা রাষ্ট্র হবার আগেই বোমার মোটর লক্ষ্মীবাইদের নিয়ে ঠাকুরপুকুর ব্রতচারীগ্রাম পার হয়ে গেছে।

জায়গাটির নাম কুমীরখালি। এখান থেকে সুন্দরবন বেশী দূরে নয়। স্থানটাকে বাংলা দেশের দক্ষিণ প্রান্ত বলা যেতে পারে। স্থানে স্থানে গভীর বন-জঙ্গল। কিছু দূরে বঙ্গোপসাগর। এই পর্যন্ত এসে লোকের বসবাস বা পল্লী শেষ হয়েছে। এর দক্ষিণে আর কোন লোক বাস করে না।

সপ্তমুখী নদী এইখানে পশ্চিমে বাঁক নিয়ে সোজা দক্ষিণ দিকে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে মিলেছে। নদীর উত্তর তীরের গ্রামটির নাম কুমীরখালি। গ্রামখানা এ অঞ্চলের মধ্যে একটু উন্নত—বেশ কিছু

লোকের বসবাস আছে, হাট-বাজার আছে, কুদঘাটা ও ফরেস্ট অফিসও আছে।

শিকারী, বাউলে বা মৌলেরা—যারা গভীর সুন্দরবনে যাতায়াত করে তাদের সকলকেই এই গ্রামে আসা-যাওয়া করতে হয়। মীরবহরপুর এখান থেকে বড়জোর মাইল খানেক দূরে।

সপ্তমুখী নদীর দক্ষিণ তীর থেকে গভীর সুন্দরবন আরম্ভ হয়েছে। দিনের বেলায়ও সেখানে বড় বড় বাঘ আর নানা রকম হিংস্র জন্তু-জানোয়ারকে মাঝে মাঝে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়।

কুমীরখালি থেকে সুন্দরবনের রেখা চোখে পড়ে। এখানকার হাট মীরবহরপুরের রায়দের। এর ইজারাদার হলো অভিমন্যু সাঁফুই। সাঁফুইমশাই এ অঞ্চলের একজন গণ্যমান্য ধনী ব্যক্তি। তাঁর চণ্ডীমণ্ডপে নিখিলবঙ্গ পল্লী উন্নয়ন সমিতির ক্যাম্প বসেছে। কলকাতা থেকে তরুণ বয়স্ক বহু স্বেচ্ছাসেবক এসেছে। তারা এই অঞ্চলের অধিবাসীদের সুখ-দুঃখ অভাব-অভিযোগ সব শুনছে। স্থানীয় লোকদের স্বাস্থ্য, বিদ্যাশিক্ষা, চাষ-আবাদ প্রভৃতির উন্নতি করতে হয় কি করে, জমিকে উর্বর করতে হয় কি প্রকারে, গৃহপালিত পশুপক্ষীর উন্নতি হয় কেমন ভাবে, তা উন্নয়ন সমিতির স্বেচ্ছাসেবকরা পল্লীবাসীদের বুঝিয়ে দিচ্ছে।

অভিমন্যু সাঁফুই শুধু স্বেচ্ছাসেবকদের স্থানই দেয় নি, এদের সব কাজে খুব সহায়তাও করছে।

স্বেচ্ছাসেবকরা সারা দিন সমিতির কাজ করে পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে। সন্ধ্যার পর পল্লীবাসীদের সঙ্গে ক্যাম্পে বসে আলাপ-আলোচনা করে, গানবাজনাও করে। এজন্যে সাঁফুইমশাই তাদের একটা হারমোনিয়াম আর একটা হ্যাজাক্স্ আলো দিয়েছে।

নিখিলবঙ্গ পল্লী উন্নয়ন সমিতির প্রচার, পরামর্শ ও সাহায্যের ফলে স্বেচ্ছাসেবকরা এ অঞ্চলে বেশ সুনাম পেয়েছে। দু-তিন দিনের মধ্যে তারা তিন-চারটে পল্লীর লোকদের আপনার করে নিয়েছে। শহরবাসী

শিক্ষিত ভদ্র বংশের ছেলেরা কেউ এমন আন্তরিকতার সঙ্গে এর আগে কোন দিন তাদের সঙ্গে মেশে নি। তারা তাই উন্নয়ন সমিতির একটা স্থায়ী ক্যাম্প এখানে করবার ব্যবস্থা করছে। মাতব্বর ব্যক্তিরা অর্থ দিতে প্রস্তুত। কিন্তু এবার স্বেচ্ছাসেবকরা বেশী দিন একস্থানে থাকতে পারবে না, তাই তারা টাকা নেয় নি। পরে যদি দরকার হয় তো নেবে, কথা দিয়েছে।

রাত বোধহয় তখন এগারোটা হবে।

সমিতির স্বেচ্ছাসেবকরা সারা দিন উন্নয়নের কাজ করে সন্ধ্যার সময় কীর্তন গান, খাওয়া ও আলাপ-আলোচনা সেরে শুয়ে পড়েছে। অভিমন্যু সাঁফুই বা অন্য পল্লীবাসীরা, যারা রাত্রে ক্যাম্পে এসেছিল, তারাও চলে গেছে অনেকক্ষণ।

চারিদিক নিঝুম নিস্তব্ধ।

বুলেট চাপা গলায় বজ্রকে বললে, "কি বুঝছো ? আজ মীরবহরপুর কাছারির সেই নব্‌নে পাইকটা এসেছিল। তুমিও তো ওদিকে গেছলে ? কি ফল হলো ?"

বজ্র উত্তর দিলে, "বীরেনদাকে ওরা কাছারিতে রাখে নি। সাধুও কাছারিতে থাকে না, কাছাকাছি কোথায় এক দ্বীপে থাকে—এই পর্যন্ত খবর পেয়েছি। আমার মনে হয়, বীরেনদাকে ওরা সেই দ্বীপেই রেখেছে। দ্বীপটা কোথায়, তা জানতে পারি নি।"

বুলেট বললে, "সেইটে জানা আমাদের প্রথম ও প্রধান কাজ।"

বজ্র বললে, "সাধু মাঝে মাঝে মীরবহরপুর কাছারিতে আসে, সারা দিন কাছারিতে থাকে, রোগীদের হোমিওপ্যাথি ঔষধ বিতরণ করে, আবার সন্ধ্যার পর চলে যায়। আসে যায় একটা ছোট ডিঙি নৌকোতে। এবার যেদিন আসবে, ঠিক সময়ে খবর পাব। নব্‌নে পাইককে সেই খবর গোপনে দেবার জন্যে দশটা টাকা দিয়েছি।"

বুলেট বললে, "এ কাজ ভীমকে দিয়েও হবে। ভীম আজ এসে গেছে। সে কুদঘাটার লোকজনের সঙ্গে আছে, ক্যাম্পে ইচ্ছা করেই

আনি নি! ও যে আমাদের লোক, তা কাউকে জানতে দেব না। ওর ওপর সাধুর বাসের সন্ধান নেবার ভার দেব।"

বজ্র বললে, "সাধুর নিজের একটা নৌকো আছে, তবে চালায় একটা মাঝি। সে লোকটা ভারি চালাক, তার কাছ থেকে কথা বের করা যাবে না। শুনেছি, কাছারির ছোট নায়েব হাবু নস্কর ছাড়া কেউ সাধুর আস্তানার খবর জানে না। কাছারির লোকদের ধারণা, সাধু গোপনে খুব ধ্যান পূজো যজ্ঞ প্রভৃতি করে, তাই অতি গোপনে থাকে।

বুলেট বললে, "ভীম এদিককার লোক, ওকে দিয়ে সাধুর সাধন-ক্ষেত্রটি আবিষ্কার করা অসম্ভব হবে না। তার জন্যে নব্‌নেকে কিছু আর বলবার দরকার নেই। ভীম মীরবহরপুরের ঘাটে থাকবে; সাধু যখন কাছারি থেকে ফিরবে, তখন ও ফলো করবে। তোমরা দুজন সঙ্গে থাকবে।"

অনেক রাত হয়েছিল। বুলেট ও বজ্র শুয়ে পড়লো।

গভীর রাত।

সুন্দরবনের মধ্যে সরু একটা নদী। তার দুপাশে গেঙ, হেতাল, সুন্দরী গাছের গভীর ঘন বন। ভয়াবহ অন্ধকারে সেই নদী দিয়ে সাধুর নৌকো চলেছে উজান ঠেলে ধীরে ধীরে। সাধু হাল ধরে আছে। একটা হিন্দুস্থানী দাঁড় বাইছে। সাধু গুনগুন করে গান গাইছে, আর মাঝে মাঝে টর্চের আলো ফেলে সামনের দিকে দেখে নিচ্ছে। জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ শোনা যায় না—শুধু মাঝে মাঝে দু-একটা শেয়াল বা ভীমরাজ পাখির আতঙ্ককর ডাক ছাড়া। একবার বাঘের ডাকও শোনা গেল। বাঘটা ডাকছে খুব দূর থেকে।

ঘণ্টা দুই চলবার পর সাধুর নৌকো নদীর কিনারায় এসে থামলো। নদীতে জোয়ার শেষ হয়েছে। ভাটার টান পড়েছে। নদীর তীরে কাঁটাভরা বোলার ঝোপ জেগে উঠেছে। নদীর তীরে নৌকো ভিড়ানো সম্ভব হলো না। সেখান থেকে জল অনেক দূরে সরে গেছে।

কাদার উপর দিয়ে মাঝিটা এসে সাধুকে কাঁধে করে তীরে এনে নামিয়ে দিলে।

ঘন ঝুপী জঙ্গল। তার মাঝ দিয়ে সরু পায়ে চলা পথ। সাধু ও মাঝি টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে চলে গেল।

তারা চলে যাবার একটু পরেই দেখা গেল, সেই পথ দিয়েই অতি সন্তর্পণে বজ্র, ভীম ও বল্লম চলেছে। তাদের হাতেও টর্চ। কিন্তু তা জ্বালে নি। সেই ঝুলের মতো কালো অন্ধকারে জন্তুজানোয়ারভরা ঝুপী জঙ্গলের মাঝ দিয়ে তারা চলেছে। সবার হাতে সড়কি ও ছোরা। ছু-একটা শেয়াল ও বাঘরোল কাছ দিয়ে চলে গেল। ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকী পোকা উড়ছে, আলো দিচ্ছে একটু একটু।

সাধু ও মাঝি প্রায় আধ মাইল জঙ্গল পার হয়ে একটা ভাঙা ইটের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। টর্চের আলো ফেলে সব দিক ভাল করে দেখে নিয়ে সাধু বাড়িটার একটা দরজায় আস্তে আস্তে টোকা দিলে।

দরজা খুলে যেতেই সাধু ঘরের মধ্যে ঢুকে আবার দরজা বন্ধ করে দিলে। মাঝি অন্য একটা ভাঙা ঘরে গিয়ে উঠলো।

সাধুর আস্তানা বাড়িটা বর্তমানে জরাজীর্ণ, কিন্তু এককালে বেশ ভাল ছিল মনে হয়। বোধহয় নীলকুঠির সাহেবদের আমলের হবে। বাড়িটার চারদিকে একসময় পাঁচিল ছিল, তা প্রায় সবটাই ভেঙে গেছে। পাঁচিলের এক দিকে আর একটা ঘর আছে। সেটা আরো বেশী জীর্ণ। এই ঘরেই বোধহয় মাঝি থাকে।

সাধুর ঘরের দরজা-জানলা সব বন্ধ থাকলেও একটা ভাঙা জানলা দিয়ে ক্ষীণ আলো দেখা যাচ্ছে। বজ্র ও ভীম সেইখানে এসে ভাঙা জায়গায় চোখ লাগিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ঘরের মধ্যে একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বলছে। মেঝের উপর হাত-পা বাঁধা অবস্থায় দুজন লোক কম্বলের উপর শুয়ে আছে। তাদের পাশে লাঠি হাতে বসে আছে একজন হিন্দুস্থানী। বন্দীদের সে পাহারা দিচ্ছে।

সাধু আহারে বসেছে। আহার শেষ হলে সে এগিয়ে এল। বন্দীদের একজনকে লক্ষ্য করে বললে, "কি নায়েবমশাই, কি ঠিক করলে বল। আমি আজ তোমার কাছ থেকে পরিষ্কার জবাব চাই। মন্দিরের নীচে থেকে একটা সিন্দুক বের হয়েছে। আরও সিন্দুক ওখানে আছে কিনা তোমাকে বলতে হবে। আর ঐ সিন্দুকের চাবি কোথায় আছে, তুমি নিশ্চয়ই জান। তার সন্ধানও দিতে হবে।"

নায়েবমশাই দৃঢ় স্বরে উত্তর দিলেন, "আমি কোন কথাই তোমায় বলবো না।"

সাধু বললে, "তার ফল কি হবে জান?"

নায়েবমশাই উত্তর দিলেন, "জানি মৃত্যু।"

সাধু বললে, "হাঁ মৃত্যু, আর খুব নৃশংস মৃত্যু।

নায়েবমশাই বললেন, "তাও জানি। পশুর কাছে তা ছাড়া আর কি আশা করা যায়?"

সাধু বললে, "গরম এখনও কাটে নি দেখছি। তোমাকে প্রথম মারবো না। তোমার চোখের সামনে প্রথমে মারবো এই বীরেনকে, তারপর তোমাকে।"

নায়েবমশাই বললেন, "বংশের কুলাঙ্গারের পক্ষে সবই সম্ভব। তবু জিজ্ঞেস করি, বীরেনের কি দোষ? ও তো কিছুতেই নেই। এ সবের কিছুই ও দাবি বা প্রত্যাশা করে না। ওর বিদ্যার জোর আছে, তাইতে ওর রাজার হালে চলে যাবে। তোমার মতো ও মূর্খ নয়, তোমার কোন ক্ষতির চিন্তাও করে না।

সাধু বললে, "পথের কাঁটা কে রাখতে চায়? ও থাকলে কাকাবাবুর নগদ টাকা, কলকাতার বাড়ি, মায় ওই সিন্দুকের মধ্যে যা আছে, সবই ও পাবে। তাই ওকে দুনিয়া থেকে সরাবো।"

নায়েবমশাই বললেন, "সব তুমিই ভোগ করবে?"

সাধু উত্তর দিলে, "নিশ্চয়ই। এই আমিই সব ভোগ করবো— একদম একলা, এক পাইও কাউকে দেব না। কাল সিন্দুক আনবার

পর তোমাদের দুজনকে শেষ করবো, তারপর কাকাকেও। তারপর সবই আমার হবে—সবই আমার।"

সাধু মহোল্লাসে অট্টহাস্য করে উঠলো—হাঃ হাঃ হাঃ।

যে লোকটা বীরেন রায়দের পাহারা দিচ্ছিল, সে সাধুকে জিজ্ঞাসা করলে, "সিন্দুকটা এখানে আনাই ঠিক করলে?"

সাধু উত্তর দিলে, "হাঁ, এখানে এনেই ভাঙবো। ওটা বেশী ভারী নয়—তিনজনেই বয়ে আনতে পারবে মনে হয়। বেশী লোককে এখানে আনবো না। ওর মধ্যে যা আছে, তার ভাগও ওদের সকলকে দেব না। তশীলদার বা ছোট নায়েবটাকে কিছু টাকা দিয়ে ভাগিয়ে দেব। কাছারির দারোয়ানদেরও দু-পাঁচ টাকা করে দেব।"

লছমন জিজ্ঞাসা করলে, "ওরা যদি তাতে দাবি ছাড়তে রাজী না হয়?"

দৃঢ়কণ্ঠে সাধু বললে, "রাজী না হয়তো দুনিয়ার দাবি তাদের ছাড়তে হবে।"

লছমন বললে, "আচ্ছা, আচ্ছা। ও কথা পরে হবে। কাল আমাকেও তো ঐখানে যেতে হবে। কিন্তু আমরা না-ফেরা পর্যন্ত কে এদের পাহারা দেবে?"

সাধু বললে, "নেই বা কেউ থাকলো! ওদের দুজনের হাত-পা খুব ভাল করে বেঁধে রেখে, ঘরে ডবল তালা লাগিয়ে যাবে। সুন্দরবনের এই দুর্গম দ্বীপের মধ্যে কে আর আসছে?"

সাধু কিছুক্ষণ কি চিন্তা করে আবার বললে, "আমি কাল সকালেই কাছারিবাড়িতে যাব, তুমি ওখানে বিকেল নাগাত যেও। আর একটা কথা,—রান্নাঘরের সামনে যে পাতকো আছে, সেখানের আগাছাগুলো সাফ করে রেখ, আমরা সিন্দুকটা এনে ঐখানে রেখে ভাঙবো। তারপর পাতকোয় খালি সিন্দুকটা ফেলে দেব। পুলিস বাবাজীরা পরে এসে কোন প্রমাণই পাবে না। পায়ের দাগগুলোও তুলে দিয়ে যাব।"

লছমন মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে রান্না ঘরে অন্য সঙ্গীদের সঙ্গে শুতে চলে গেল। সাধু ঐ ঘরেই একটা বিছানার উপর শুয়ে পড়লো। আলোটা জ্বালাই রইল।

বঙ্কু সরে এল জানলার কাছ থেকে। রাত শেষ হতে আর বোধহয় বেশী দেরী নেই।

কুমীরখালি হাটের উপর বুলেটের বক্তৃতা বেশ জমে উঠেছে। বহু চাষী লাটদার চকদার ব্যাপারী তার বক্তৃতা শুনছে আর তারিফ করছে।

বুলেট বক্তৃতা দিচ্ছে, "ভগবান জল দিলে না বলে আকাশের দিকে চেয়ে বসে থাকবেন না। গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে পুকুর কাটাবেন, নলকূপ বসাবেন। যে সব নদীর জলে নোনা নেই, সেই নদী থেকে নালা কেটে জমিতে জল দেবার চেষ্টা করবেন। পল্লী অঞ্চলে গরু ছাগল হাঁস মুবগী মড়কের সময় হাজারে হাজারে মরে। মড়ক থেকে কি করে তাদের রক্ষা করা যায়, তা আপনাদের জানতে হবে। বর্তমান কালে তাদের রক্ষা করার যথেষ্ট উপায় বের হয়েছে। জমির বাঁধ ভেঙে গিয়ে চাষ-আবাদ নষ্ট হয়। সেজন্যে গভর্নমেণ্ট বা জমিদারদের মুখাপেক্ষী না হয়ে থেকে আপনারা নিজেরা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তৈরি করে বাঁধ বাঁধবেন। প্রায় গ্রামেই বিদ্যাশিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। নিজেরা যাঁরা কিছু কিছু লেখাপড়া জানেন, তাঁরা কিঞ্চিৎ ত্যাগ স্বীকার করে কোন অবস্থাপন্ন লোকের চণ্ডীমণ্ডপে বা বাইরের ঘরে পাঠশালা বসাবেন। এর জন্যে খরচ খুবই কম। আশা করা যায়, পরে সরকারী সাহায্যও পেতে পারেন। আপনারা গ্রামের সকলে মিলে দাবি জানাবেন সরকারের কাছে। আমরা মিলিতভাবে দাবি করি না, তাই অনেক কিছুই পাই না।"

নিশ্চয়! নিশ্চয়! শ্রোতাদের মধ্যে বেশ সাড়া পড়ে গেল।

বিকাল থেকেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। জমাট মেঘে আকাশ কালো। বাতাস পড়ে গেছে। এই সময় হঠাৎ ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু করলে। সভা আর চললো না। শ্রোতারা দ্রুত রওনা হলো বাড়ির দিকে। বুলেট একটা দোকানে এসে উঠলো। তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

গভীর সুন্দরবনের মাঝে মহা দুর্যোগের রাত। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, ক্ষণেকের জন্যে থামছে এক-একবার। কিন্তু ঝড়ের তাণ্ডব চলেছে সমানে—অবিরাম ভয়ঙ্কর।

কেওড়া-গরাণ গাছের ঘন জঙ্গলে গাছে গাছে ঘর্ষণ লেগে মাঝে মাঝে শব্দ হচ্ছে কড়্—কড়্ কড়্—কড়্। যে কোন সময় দাবাগ্নি জ্বলে উঠতে পারে। নদীতে বড় বড় ঢেউ পাড়ের বালিয়াড়ির উপর আছাড় খেয়ে পড়ছে।

প্রকৃতির রূপ যেমন বীভৎস তেমনি ভয়াবহ। হেঁতাল ঝোপের মধ্যে দু-একটা বনচারী জীব চলাফেরা করছে সড় সড় শব্দে। ফেউ ডাকছে তারস্বরে। কাছাকাছি কোথাও বাঘ বেরিয়েছে।

'রোঘ' দ্বীপের বহু দিনের পরিত্যক্ত ভাঙা বাড়ির একটি ঘরে ফাটল-ভরা মেঝের উপর কম্বলের শয্যায় হাতপা বদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছেন বীরেন রায় আর তাঁর এস্টেটের নায়েবমশাই শ্রীচরণ দাশ। রাত বেশ হয়েছে। অথচ দুজনের চোখে ঘুম নেই। এ অবস্থায় কারোই ঘুম আসতে পারে না। আজ তাঁদের দুজনের জীবনের শেষ রাত—তাঁরা জেনেছে।

নায়েবমশাই বীরেন রায়কে বাঁচাবার জন্যে শেষ পর্যন্ত সাধুর হাতে-পায়ে ধরেছে। বীরেন রায় শৈলেনবাবুর কোন সম্পত্তি নেবেন না বলে প্রতিজ্ঞাও করেছেন। কিন্তু সাধু তাঁদের কাউকে ছেড়ে দিতে রাজী নয়। সে স্থির করেছে, আজ নিজের হাতে এদের দুজনকে গুলি করে মারবে।

সাধুদের আজ মহা উল্লাস। গুপ্তধনের সিন্দুকটি ওরা আজ এইখানে এনে ভাঙবে। তার পর বীরেন রায় ও নায়েবমশাইকে হত্যা করে ঐ ভাঙা সিন্দুকের সঙ্গে বেঁধে শুক্‌নো পাতকোর মধ্যে ফেলে দেবে।

নায়েবমশাই ধরা গলায় বীরেনবাবুকে বললেন, "খোকাবাবু, নিজে মরি তাতে ক্ষোভ নেই, আমার বয়স প্রায় সাতষট্টি পার হতে চললো। আমার জীবনের মেয়াদ এমনিতেই আর কত দিন! দুঃখ হচ্ছে তোমার জন্যে। এই কম বয়েস, বিলেত থেকে এত লেখাপড়া শিখে এসেছ, ভবিষ্যতে একজন নামজাদা গণ্যমান্য লোক হতে পারতে। কিন্তু তোমার এ অমূল্যজীবন শেষ হতে যাচ্ছে এই পশুটার হাতে, কেউ রক্ষা করতে পারলো না। এই গহন দুর্গম সুন্দরবনে পুলিস কেন, এমন কোন জনপ্রাণীও নেই···হায়!· ভগবানও কি নেই?"

খট্ করে একটা শব্দ হলো ঘরের কোণ থেকে। সঙ্গে সঙ্গে একটা জানালা খুলে গেল। চমকে উঠলেন বীরেনবাবু ও নায়েবমশাই। বিস্ফারিত চোখে তাঁরা চেয়ে রইলেন সেই দিকে। অসহায় বিহ্বল চাউনি।

সাবেক ধরনের ঘর—বেশীর ভাগ জানালা প্রায় কড়িকাঠের কাছাকাছি। একটা হাফপ্যাণ্ট-পরা লোক সেই জানালা দিয়ে ওপর থেকে ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়লো। দ্রুত সে এগিয়ে এল ওদের দিকে। তার সারা দেহ জলে ভিজে গেছে, হাতে একটা ছোরা।

বীরেনবাবু ও নায়েবমশাইয়ের চোখে অসহায় বিহ্বল দৃষ্টি। ছোরা হাতে লোকটি সোজা তাদের দিকে আসছে। আর নিস্তার নেই—কয়েক মুহূর্ত মাত্র!

অকস্মাৎ লোকটি বীরেন রায়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপা গলায় বললে, "ভয় নেই বীরেনদা, আমি বুলেট।"

"বুলেট!" বীরেনবাবু বিস্ময়ে আনন্দে প্রায় চীৎকার করে উঠলেন।

আর্ত বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে নায়েবমশাই বলে উঠলেন, "নারায়ণ! নারায়ণ! তুমি আছ তাহলে!"

বুলেট দ্রুতহস্তে বীরেনবাবু ও নায়েবমশাইয়ের সব বাঁধন খুলে দিয়ে বললে, "আর ভয় নেই। আমরা শক্তি-সংঘের তোমার নজন শিষ্য এসে গেছি। তোমাদের উদ্ধার করবো।"

বজ্রও জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে এসে আলোটা জোর করে দিলে। তার সঙ্গে ব্যাগে ভরতি খাবার। বীরেনবাবু ও নায়েবমশাইকে সেগুলি দিয়ে বললে, "খেয়ে গায়ে বল করে নিন।"

সব কথা শুনে বীরেন রায় বললেন, "তোমরা ওদের সঙ্গে লড়তে চাচ্ছ। কিন্তু ওরা সবাই ভীষণ বলবান আর সংখ্যায়ও তিন-চার জন হবে। তা ছাড়া মণ্টুদার একটা পিস্তলও আছে।"

বুলেট বললে, "আমাদের কাছেও হাতিয়ার কিছু আছে। সংখ্যায় আমরাও কম নই। একটা সত্যিকাবের রিভলভারও পেয়ে গেছি। বীরেনদা আপনি শুনলে গর্ববোধ করবেন, এই রিভলভারটা সংঘের বোনেদের দ্বারা পৈলানের হাবু নস্করের বাড়ি থেকে দুঃসাহসিক-ভাবে সংগ্রহ কবা হয়েছে। আমরা হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে ওদের আক্রমণ করবো। ওরা প্রস্তুত হবার আগেই ওদের ঘায়েল করবো।"

সায় দিয়ে বজ্র বললে, "ওরা শক্তি প্রয়োগের আগেই ওদের আমরা আক্রমণ করে দমিয়ে দেবো।"

বীরেনবাবু তাদের দিকে তাকিয়ে আছেন, ভাবছেন, "স্বপ্ন দেখছি না তো। বজ্র আর একবার উদ্ধার করবার চেষ্টা করেছিল, সেই রকম যদি হয়।"

বুলেট কি চিন্তা করছিল। বললে, "আচ্ছা বীরেনদা, আমরা যদি এখুনি তোমাদের ঘর থেকে সরিয়ে নিয়ে অন্য কোথাও রেখে আসি, তাহলে কেমন হয়? ঘাটে আমাদের দুটো ডিঙি আছে।"

বীরেনবাবু বললেন, "আমরা দুজনেই শুধু যাব আর তোমরা?"

বুলেট উত্তর দিলে, "আমরা? আমরা এই ডাকাতের দলকে শায়েস্তা করে তবে যাব। এরা আমাদের কত বড় ক্ষতি করতে গিয়েছিল! এদের ক্ষমা করবো না। এদের সঙ্গে লড়বো।"

নায়েবমশাই বললেন, "আমি যাব না তোমাদের ফেলে।"

বীরেনবাবুও তাঁর কথায় সায় দিয়ে বললেন, "আমাদের যাওয়া হতে পারে না। আমাদের প্রাণরক্ষা করতে এসেছ তোমরা। আর আমরা তোমাদের এই পশুদের হাতে ফেলে নিজেরা চলে যাব,—তা হতেই পারে না। আমিও তোমাদের সঙ্গে লড়াইয়ের সময় থাকবো, যতটা পারি সহায়তা করবো।"

নায়েবমশাই বললেন, "আমি বৃদ্ধ হয়েছি বটে, কিন্তু গায়ে এখনো যথেষ্ট শক্তি আছে। আমার প্রতিজ্ঞা, যদি সুযোগ পাই, বংশের ঐ কুলাঙ্গারটাকে নিজের হাতে শেষ করবো। ও যদি বেঁচে থাকে, তাহলে বীরেনকে ও সারা জীবন জ্বালাবে। এজন্যে আমার জেল-ফাঁস যা হয় হোক, আমি গ্রাহ্য করি নে। এই ঘরেই একটা টাঙি আছে দেখেছি। তাই দিয়ে নরপিশাচ মণ্টুকে আমি শেষ করবো।"

ঘরের আবহাওয়া থমথম করছে। দরজা-জানালার ফাঁক দিয়ে ঝোড়ো হাওয়া মাঝে মাঝে ঘরে ঢুকে আলোটাকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

সাধুর বিছানার তলা থেকে টাঙিটা টেনে নিয়ে নায়েবমশাই বসে আছেন। তাঁর দুই চোখ যেন জ্বলছে।

বুলেট বললে, "আপনারা যখন আমাদের ফেলে যাবেন না ঠিক করেছেন, তখন এক কাজ করুন। নায়েবমশাই টাঙিটাকে নিজের কম্বলের মধ্যে এখন লুকিয়ে রাখুন। বীরেনদার হাতে একটা ছোরা দিচ্ছি। আপনারা এই দুটি অস্ত্র নিয়ে যেমন শুয়ে ছিলেন, তেমনি কম্বল জড়িয়ে শুয়ে থাকুন। আমরা কি ভাবে আজ লড়াই করবো, তা মোটামুটি যা ঠিক করেছি, আপনাদের বলি। তবে কাজের ক্ষেত্রে এর রদবদল হতে পারে কিছু কিছু।

"আমরা প্রথম আক্রমণ করবো মণ্টুবাবুকে। তার হাত থেকে ব্যাগটা ছিনিয়ে নিতে পারলে ওর পিস্তলটা আমাদের হাতে এসে যাবে। তাহলে আমাদের জয় প্রায় সুনিশ্চিত। ওদের বলবিক্রম অর্ধেক কমে যাবে ঐ একটা ঘটনায়। কাল আড়াল থেকে ওদের কথাবার্তা শুনে বুঝেছি, ওদের হাতে আর কোন পিস্তল বা বন্দুক জাতীয় জিনিস নেই। তবে ওদের সকলের কাছে সব সময় ছোরা থাকে।"

বীরেন রায় বললেন, "ঠিক কথা। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, মণ্টুদা খুব শক্তিশালী।"

বুলেট উত্তর দিলে, "শক্তি প্রয়োগের সুযোগই দেব না।"

বজ্র বীরেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা, এই ঘরে রোজ প্রথম ঢোকে আপনার মণ্টুদা, ওর কাছে এই ঘরের চাবি থাকে—না?"

বীরেনবাবু উত্তর দিলেন, "হাঁ! মণ্টুদা আর লছমন ছাড়া এই ঘরে কেউ ঢোকে না। ওদের দলের অন্য সবাই ওই পাঁচিলের কাছে যে রান্নাঘরটা আছে ঐ ঘরে থাকে। সময় সময় লছমন এই ঘরে থাকে, কিন্তু রাত্রে থাকে না। মণ্টুদাই শুধু দিনে রাতে এই ঘরে থাকে।"

বুলেট বললে, "আচ্ছা বেশ। তাহলে শুনুন বীরেনদা, আমরা কি ভাবে এদের সঙ্গে লড়বো, তার বাকিটুকু বলি। কাল আমরা শুনেছি, ওদের দল সেই সিন্দুকটাকে রান্নাঘরের সামনে এনে রাখবে। তার মানে, দলের সবাই ওইখানেই থাকবে। মণ্টবাবু মনে হয়, সিন্দুক ভাঙবার জন্যে ছেনি হাতুড়ি নিতে বা আপনারা কি করছেন দেখতে, একবার নিশ্চয়ই এই ঘরে আসবে। হয়তো একলা আসবে, কি বড়জোর লছমন ওর সঙ্গে থাকতে পারে। আমি ও বজ্র এই ঘরে ঢোকবার দরজার তুপাশে তুজন দাঁড়িয়ে থাকবো। আমার হাতে থাকবে রিভলবার, বজ্রর হাতে ছোরা। মণ্টুবাবু ঘরে ঢুকলেই ওর বুকের ওপর রিভলবার ধরে ওর হাত থেকে পিস্তলটা কেড়ে নিয়ে

বাঘের হাতে দেব। বাঘ ঘরের সামনে ভাঙা থামের আড়ালে এই জন্যেই অপেক্ষা করবে। সে পিস্তলটা হাতে পেয়েই পাতকোর ধারে গিয়ে আত্মগোপন করে দাঁড়াবে। সেখানে ঐ সময় আমাদের দলের অন্য সকলে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গোপনে অপেক্ষা করবে। তাদের হাতে সড়কি বর্শা ছোরা আর চার-পাঁচটা টয়-পিস্তল আর থিয়েটারের তলোয়ার থাকবে। আর একটা কথা এর মধ্যে বলা দরকার। আমরা যখন মণ্টুবাবুকে রিভলভার দেখিয়ে ঠাণ্ডা করে দেব, ঠিক সেই মুহূর্তে নায়েবমশাই ও আপনি তুজনে দড়ি দিয়ে ওকে বেঁধে ফেলবেন, সঙ্গে সঙ্গে মুখে কাপড় গুঁজেও দেবেন, যেন চেঁচিয়ে দলের কাউকে ডাকতে না পারে। রান্নাঘরটা বেশী দূরে নয়, জোরে চেঁচালে ওখানে শব্দ পৌঁছুতে পারে।'

হঠাৎ দূরে থেমে থেমে তিনবার ফেউ ডেকে উঠলো। মিনিট খানেক বিরতির পর আবার কানে এল ফেউয়ের ডাক। এবার তুবার।

সংকেত শুনে বুলেট ত্রস্ত হয়ে বললে, "ওরা আসছে। নাউ বি রেডি।"

সে তাড়াতাড়ি কতকগুলো আছাড়ে-পটকা বীরেন রায়ের হাতে দিয়ে বললে, "আমি ইশারা করলেই এগুলো ছুঁড়বেন।

প্রকৃতির তাণ্ডব লীলা কিছু কমেছে। অল্প অল্প বৃষ্টি হচ্ছে। ঝড়ের বেগও বিশেষ নেই।

সাধুদের অর্থাৎ মণ্টুবাবুদের আজ মহা আনন্দের দিন। তাদের বহু দিনের বহু পরিশ্রম আজ সফল হতে চলেছে। প্রাচীন কালের সিন্দুকটা তাদের মুঠোর মধ্যে।

অন্ধকার ঝোপজঙ্গলের মাঝ দিয়ে মণ্টুবাবু টর্চের আলো ফেলে আসছে। তার পিছনে লছমন, মাহাতো আর আগলু একটা মোটা বাঁশে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে সিন্দুকটা কষ্টে বয়ে নিয়ে আসছে।

বাঁশের সামনে একা লছমন, আর পিছনে মাহাতো ও আগলু। মণ্টুবাবু মাঝে মাঝে লছমনকে সাহায্য করছে। মণ্টুবাবু এগিয়ে এসে পাতকোর ধারে পরিষ্কার করা জায়গাটা দেখিয়ে সঙ্গীদের বললে, "এইখানে ওটা রাখ।"

সন্তর্পণে সিন্দুকটা সেইখানে রেখে তিন জনেই মাটির উপর বসে পড়লো। হাঁফাচ্ছে তারা। একটু পরে লছমন রান্নাঘর থেকে একটা মশাল এনে জ্বেলে দিলে।

মণ্টুবাবু সঙ্গীদের বললে, "আগে ওদের দুটোকে শেষ করে তারপর সিন্দুকটা ভাঙা হবে, কি বল ?"

লছমন বললে, "না। আগে সিন্দুকটা ভাঙা হোক। ভাগ বাঁটোয়ারা হয়ে গেলে, তারপর ওদের এখানে এনে গুলি করা যাবে। ওরা আর যাচ্ছে কোথায় ?"

মণ্টুবাবু বললে, "বেশ তাই হবে। আমি আমার ঘর থেকে ছেনি হাতুড়ি নিয়ে আসি। ওদেরও একবার দেখি।"

টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে মণ্টুবাবু চলে গেল। তার আনন্দটা আজ বোধহয় সবচেয়ে বেশী। তার কারণও আছে। ওদের নিজেদের মধ্যে চুক্তি হয়েছে, সিন্দুক থেকে যা পাওয়া যাবে, তার দশআনা ভাগ সে পাবে, আর বাকী ছআনা পাবে মাহাতো, আগলু ও লছমন। হাবু নস্কর বা অন্য যারা তাদের এই কাজে সাহায্য করেছে, তাদের সামান্য কিছু নগদ টাকা দেওয়া হবে।

মণ্টুবাবু গুনগুন করে গান করতে করতে ঘরে ঢুকে মেঝের উপর ডাক্তারী ব্যাগটা রেখে নায়েবমশাই ও বীরেন রায়কে উদ্দেশ করে বললে, "এইবার তোমরা নিজেদের ইষ্ট দেবতার নাম জপ করতে শুরু করো। আর বেশীক্ষণ তোমাদের এ জগতের কষ্ট সইতে হবে না। তার ব্যবস্থা—ওঃ !"

হঠাৎ কারা দুজন তাকে পিছন থেকে ভীষণ জোরে জড়িয়ে ধরলে। সেও খুব বলশালী। সে সজোরে এক ঝটকা মেরে তাদের

ছিটকে ফেলে দিলে ; কিন্তু পরক্ষণেই দেখলে, তার সামনে—মাত্র এক হাত দূরে, তার ঠিক বুকের উপর পিস্তল ধরে একজন মুখোশ-পরা লোক দাঁড়িয়ে আছে।

বুলেট আদেশের স্বরে বললে, "হ্যাণ্ডস্ আপ্। হাত তোল! একটু টু শব্দ করলেই এই পিস্তলের ছটা গুলিই তোমার বুকে ঢুকবে।"

ব্যাপারটা এত আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত যে মণ্টুবাবুর কাছে দুঃস্বপ্নের মতোই মনে হয়। নিজের চোখকেই সে বিশ্বাস করতে পারছে না।

ব্যাগটা যেখানে রেখেছিল, সেই দিকে সে পা বাড়ায়। পরক্ষণে তার কোমরে সজোরে একটা লোহার ডাণ্ডা পড়লো।

"ওঃ!" বলে মণ্টুবাবু মেঝের উপর পড়ে পেল। ব্যাগটা ইতিমধ্যে বাঘ সরিয়ে ফেলেছে। বজ্র ও নায়েবমশাই ঝাঁপিয়ে পড়লো মণ্টু-বাবুর উপর, আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেললে তাকে। বুলেট পিস্তল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মণ্টুবাবুর মুখের মধ্যে ওরা একটা রুমাল ঢুকিয়ে দিলে। অসহায়ভাবে সে চেয়ে থাকে ওদের দিকে। সারা দেহ দড়ি-বাঁধা। নায়েবমশাই ধারালো টাঙিটা নিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বীরেনবাবু চুপ করে সব দেখছেন। মণ্টুকে বাঁধতে তাঁর হাত ওঠে নি।

বুলেট নায়েবমশাইকে বললে, "আপনি ঠিক এই ভাবেই থাকুন। কিছু করাব দরকার নেই। ও কিছুই করতে পারবে না। আমি আর বজ্র পাতকোর দিকে যাচ্ছি। বীরেনদা আপনি পটকাগুলো ছুঁড়তে থাকুন।"

দুম্! দুম্! দুম্! দুম্!

ভয়ঙ্কর শব্দ পর পর তিন-চারটা। সুন্দরবনের নির্জন গভীর রাতের আকাশবাতাস কেঁপে উঠলো। মরণ আতঙ্ক মাহাতোদের দলে—লাফিয়ে উঠলো তারা। দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালাতে

যাবে, এমন সময় তু-তিনটা টর্চের তীব্র আলো তাদের মুখের উপর পড়লো। অন্ধকার থেকে হুঙ্কার, "খবরদার! হ্যাণ্ডস্ আপ! সবাই হাত তোল! নড়েছ কি মরবে!"

মাহাতোরা দেখলে, কালো কালো মুখোশ-পরা আট-নজন লোক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাদের ঘিরে ফেলেছে। তাদের একেবারে সামনে যে তুজন দাঁড়িয়ে আছে, তাদের এক জনের হাতে পিস্তল, অপরের হাতে রিভলবার। অন্য সবার হাতে খোলা তলোয়ার, ছোরা, বর্শা, সড়কি।

লছমন উঠে দাঁড়াবার উপক্রম করতেই একটা সড়কি এসে তার পায়ে বিঁধলো। আর্তনাদ করে সে বসে পড়লো। বুলেট পিস্তল উঁচিয়ে আবার হুঙ্কার ছাড়লে, "হাত ওঠাও! জলদি—এক তুই তিন—!"

তুম্! তুম্! তুম্! আবার সেই শব্দ। এবার আরও কাছে; আরও ভয়ঙ্কর।

হিন্দুস্থানী পলোয়ানেরা এবার সুবোধ বালকের মতো হাত তুলে দাঁড়ালো। তিন-চার জন মুখোশ-পরা লোক চোখের নিমিষে তাদের হাত পিছমোড়া দিয়ে বেঁধে ফেললে।

বুলেট হুকুম করে, "আও, হামারা সাথ।"

ঘরের দিকে সে পা বাড়ায়। বিনা বাক্যব্যয়ে ওরা হুকুম তামিল করে। লছমন খোঁড়াচ্ছে। ওদের তুপাশে বুলেট ও বজ্র, হাতে পিস্তল ও রিভলবার। পিছনে আর সবাই।

এতক্ষণ প্রকৃতি কিছু শান্ত ছিল। আবার তাণ্ডব শুরু হয়। প্রবল ঝড়ে বড় একটা সুন্দরী গাছ মড়মড় শব্দে ভেঙে পড়লো কিছু দূরে। নিকষকালো অন্ধকার আকাশে মাঝে মাঝে বিত্যুৎ চমকাচ্ছে। বৃষ্টির ধারাও নামলো যেন আকাশ ভেঙে।

বন্দী মাহাতোর দলকে ঘরে ঢুকিয়ে বুলেট আবার হুকুম করলে, "সবকোই লেট যাও।" মণ্টুবাবুর পাশে তারা সবাই ধুলো-ভরা মেঝের উপর শুয়ে পড়লো।

মাহাতোরা দেখলে, কালো কালো মুখোশ-পরা

বাঘ ও বোমাকে বুলেট বললে, "এদের পাগুলোও দড়ি দিয়ে বাঁধো। বজ্র, তুমি পিস্তল নিয়ে সতর্ক থাকো, একটু বেয়াদপি করলেই কুকুরের মতো গুলি করে মারবে। এরা মানুষ নয়, পিশাচ।"

নায়েবমশাই বললেন, "সব চেয়ে হিংস্র পিশাচ থাকতে হয় তো আছে এই সাধুভেকধারী বংশের কুলাঙ্গারটি। আমি যা প্রতিজ্ঞা করেছি, এইবার তা পালন করবো।"

নায়েবমশাই টাঙি-হাতে মণ্টুর দিকে পা বাড়ালেন। মণ্টুর দুই চোখ আতঙ্কে বিস্ফারিত। সে ডুকরে কেঁদে উঠলো।

মণ্টু ও নায়েবমশাইয়ের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন বীরেন রায়।

... ...

কলকাতার টেম্পল্ চেম্বারস্-এর মরিস এণ্ড মিটার সলিসিটারস্ অফিস আজ মহাসরগরম।

বেলা এগারোটা বাজতে না বাজতেই সেখানে এসে গেছেন বহু সম্মানিত ব্যক্তি—খ্যাতনামা ঐতিহাসিক, অধ্যাপক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, পদস্থ রাজকর্মচারী প্রভৃতি।

বরাকরের আশ্রম থেকে শৈলেনবাবুর আসাটা বিশেষ অপ্রত্যাশিত হলেও তাঁকে আসতে হয়েছে বন্ধু ও উক্ত ফার্মের সিনিয়র পার্টনার এটর্নি চুনীবাবুর জরুরী ডাকে।

এটর্নি অফিসের প্রশস্ত হল-ঘরের প্রায় মাঝখানে একটি কেদারায় শৈলেনবাবু, তাঁর পাশে বীরেনবাবু ও তাঁর দুজন বন্ধু এটর্নি অমিতাভ সেন ও অধ্যাপক ডঃ ললিত চৌধুরী বসে আছেন।

দেওয়ালের ধারে শক্তি-সংঘের ছেলে-মেয়েরা বসে আছে। ছেলেদের সকলের স্কাউট ও মেয়েদের গার্লস্ গাইডের পোশাক। নায়েব মশাই আছেন একটু দূরে। তিনি বীরেনবাবুদের এস্টেটের উকিলের সঙ্গে কথা বলছেন। বীরেনবাবুর মামা মিস্টার মিত্র ও চাকর ভানুও উপস্থিত।

সুন্দরবনের মাঝ থেকে আনা বহুকালের প্রাচীন লোহার সিন্দুকটা আজ এইখানে খোলা হবে সকলের সামনে। হলের প্রত্যেকের মন সেই সিন্দুকের দিকে।

সিন্দুকটা হলের ঠিক মাঝখানে রাখা হয়েছে।

নায়েবমশাই সেই দিকে তাকিয়ে উকিল দেবেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ সিন্দুকের মধ্যে যা আছে তার মালিক কে হবে, বলতে পারেন ?"

কিছুক্ষণ চিন্তা করে দেবেনবাবু উত্তর দিলেন, "ঠিক বলা যায় না, গভর্নমেণ্ট দাবি করতে পারে, বাবুরাও পেতে পারেন। এর মধ্যে কোন ডকুমেণ্ট আছে কিনা দেখা যাক।"

ওদের কথা শৈলেনবাবুর কানে যেতে তিনি বললেন, "না, ভাই ওই সিন্দুকের মধ্যে যা আছে তা আমরা দাবি করতে পারি নে। ওসব .সম্পত্তি আমাদেব কোন পূর্বপুরুষের কাছে কে যেন গচ্ছিত রেখেছিলেন—তাঁকে বা তাঁর উত্তরাধিকারীকে ফিরিয়ে দেবার চুক্তিতে বা বিশ্বাসে। এই পর্যন্ত আমি জানতে পেরেছি আমাদের জমিদারীর একটা বহু পুরোনো কাগজ থেকে, আর বেশী কিছু জানতে পারি নি। ওর মধ্যে কি আছে কিংবা আমাদের কোন্ পূর্বপুরুষের কাছে কে বা কি কারণে কোন্ সময়ে এই সব রেখেছিলেন, তা কিছুই জানি নে।"

পুলিস অফিসার দুজন এসে গেলেন। এঁদের জন্যেই অপেক্ষা করতে হচ্ছিল। এইবার সিন্দুক খোলা হবে।

সিন্দুকটার চাবি পাওয়া যায় নি, একটা মিস্ত্রীর সাহায্যে খোলা হবে। মিস্ত্রী উপস্থিত তার যন্ত্রপাতি নিয়ে। পুলিস সাহেবের আদেশে সে সিন্দুকের পিছনের দিকের কব্জা কাটতে শুরু করলে।

বীরেন রায় বুলেটকে কাছে ডাকলেন। শক্তি-সংঘের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বুলেট তাঁর সামনে এসে স্যালুট করে পা ঠুকে দাঁড়ালো।

পুলিস সাহেব বুলেট ও শক্তি-সংঘের ছেলে-মেয়েদের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে চব্বিশ পরগনার পুলিস সুপারকে বললেন,

"শক্তি-সংঘের ছেলে-মেয়েদের দেখলে শুধু মনে আনন্দ হয় না, অনেক আশাও জাগে।"

এস. পি. উত্তর দিলেন, "এরা এই কেসে যা কৃতিত্ব ও বীরত্ব দেখিয়েছে, তাতে মনে হয় আমাদের দেশের স্বাধীনতা আমরা কৃতিত্বের সঙ্গেই রক্ষা করতে পারবো। এরা যা কাজ করেছে, তা যে কোন স্বাধীন দেশের গর্বের বিষয়। আমি এদের শুধু ধন্যবাদ দিয়েই ক্ষান্ত হবো না—এদের সকলকে পুলিসেব পক্ষ থেকে বীরত্বের পুরস্কার দেবারও ব্যবস্থা করবো।"

কব্জা কেটে সিন্দুকটা খুলে ফেলা হলো। বীরেন রায়ের নির্দেশ মতো ও পুলিস সাহেবের অনুমোদনে বুলেটকে ভার দেওয়া হলো সিন্দুকের মধ্যের জিনিসগুলি একে একে বের করবার।

হলের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন ওঠে। সবাই নিঃসন্দেহ, এইবার বের হবে হীরা, পান্না, মোহর, সোনার তাল। তার পরিমাণ নিয়েই বোধহয় শুরু হয় গুঞ্জন।

বুলেট সিন্দুকের মধ্যে হাত ঢোকালে। প্রথমে বের হলো রেশমের তৈরী একটা বিরাট নিশান—গভীর লাল রঙের। তার বহু জায়গা পোকায় কেটে নষ্ট করেছে। নিশানটার চারদিকে জরির ঝালর, মাঝখানে সলমা ও জরি দিয়ে সূর্য আঁকা বা বোনা। সূর্যের নীচে কি লেখা ছিল, পড়া গেল না।

নিশানের পর বের হলো ফুলস্কেপ কাগজের মাপের একটি পাতলা তামার পাত। তামার পাতটির এক কোণে রূপোর তার দিয়ে বাঁধা একটি পোড়ামাটির সিল বা মোহর। সিলটা ডিম্বাকৃতি ও ছোট—এর অনেক স্থান ক্ষয়ে গেছে।

তামার পাতটা বহু শতাব্দী সিন্দুকের মধ্যে থাকায় নওলা ধরে কালো হয়ে গেছে। তার উপর খোদাই করা কিসব লেখা আছে দেখা গেল।

এটর্নি চুনী মিত্র পুলিস সাহেবকে বললেন, "আপনাদের চোখ তো খুব ধারালো। দেখুন, তামার পাতটায় কিসব লেখা আছে, পড়তে পারেন কিনা ?"

পুলিস সাহেব তামার পাতটা চোখের খুব কাছে নিয়ে কিছুক্ষণ পড়বার চেষ্টা করে বললেন, "এতে বাংলা ভাষাই লেখা আছে, কিন্তু অনেকগুলো অক্ষর ঠিক পড়া যাচ্ছে না।"

পুলিস সাহেব তামার পাতটা টেবিলের উপর রেখে দিতে বীরেন রায় তাঁর বন্ধু অধ্যাপক ডক্টর ললিত চৌধুরীকে দেখিয়ে বললেন, "ইনি ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক। ইনি চেষ্টা করলে বোধহয় পাঠোদ্ধার করতে পারবেন।"

ডক্টর চৌধুরী প্রথমে সেই পোড়ামাটির তৈরী সিলটা পড়বার চেষ্টা করেন।

সবাই উৎকর্ণ।

কিছুক্ষণ বাদে সিলের উপর থেকে চোখ তুলে অধ্যাপক চৌধুরী বললেন, "এই সিলের উপর লেখা রয়েছে সং ২৫ মাঘ দিনে গুহস্থ প্রতাপাদিত্য।"

সবাই বিস্মিত হতবাক! বীরেন রায় বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, "প্রতাপাদিত্যের সিল! মহারাজ প্রতাপাদিত্যের ?"

মাথা নেড়ে শৈলেনবাবু বললেন, "ঠিক! ঠিক! আমাদের পূর্ব-পুরুষদের কে যেন মহারাজ প্রতাপাদিত্যের নৌ-সেনা-পতি বা মীরবহর ছিলেন। বহু দিন আগে জমিদারীর কাগজপত্রের মাঝ থেকে এক টুকরো কাগজ পাই, তাতে এই রকম একটা কথা লেখা ছিল। তখন ভালো বুঝতে পারি নি।"

ডক্টর চৌধুরী তামার পাতটা পড়বার চেষ্টা করছিলেন আর কি যেন নোট করছিলেন।

সকলের দৃষ্টি তাঁর উপর নিবদ্ধ।

বহুক্ষণ বাদে পড়া ও নোট করা শেষ করে অধ্যাপক চৌধুরী বললেন, "প্রথমেই বলি, এটা হলো মহারাজ প্রতাপাদিত্যের একটা আজ্ঞাপত্র—তাম্রশাসনও বলা যায়। মোগল বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সঙ্গে যখন তাঁর ধুমঘাটায় যুদ্ধ চলছিল, সেই সময় তিনি এটা লিখে তাঁর একজন অতি বিশ্বস্ত ও উচ্চ কর্মচারীকে দেন। এই তাম্রশাসন বাংলা ভাষাতেই লেখা, তবে এর বহু অক্ষর দেবনাগরীর মতো। একে ত্রিহুটে অক্ষর বলে। তিন-চারশো বছর আগে এই রকম অক্ষর আমাদের বাংলা দেশে চলিত ছিল। এর বহু স্থান আমি ঠিক পড়তে পারি নি, কোন কোন জায়গায় ধারণা করে নিয়েছি। তখনকার ভাষার সঙ্গে এখনকার ভাষার একটু তফাতও আছে। সেইজন্যে এই তাম্রশাসনের ভাষা হুবহু বললে আপনাদের সকলে হয়তো ঠিক বুঝতে পারবেন না। আমি সেই ভাষা যথাসম্ভব বজায় রেখে আধুনিক চলিত ভাষায় যা নোট করেছি, তাই বলছি—

"মীরবহর ও ধুমঘাটার দুর্গরক্ষক শ্রীমধুসূদন বসু (রায়)

"মোগল সৈন্যেরা আমার যশোহর রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে। ইহার ফল হয়তো রাজ্যের প্রজাদের পক্ষে মঙ্গলকর হইবে না, এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি মোগলদের সহিত সন্ধি করিব, স্থির করিয়াছি। তজ্জন্য আমি মোগল সুবাদার ইসলাম খাঁর সহিত সাক্ষাৎ সন্ধির প্রস্তাব করিবার জন্য বাংলার রাজধানী ঢাকা নগরে যাইতেছি। যুদ্ধ এখন বন্ধ থাকিবে, উভয় পক্ষ হইতে এই চুক্তি হইয়াছে। আমার পুত্র যুবরাজ উদয়াদিত্য রাজকার্য পরিচালনা করিবে। আমি আমার রাজমুকুট ও পতাকা তোমার কাছে রাখিয়া যাইতেছি। রাজ্যে শান্তি ফিরিয়া আসিলে, তৎকালে আমি যদি জীবিত থাকি তাহা হইলে আমাকে, নচেৎ আমার স্থলাভিষিক্ত আমার বংশধরকে তুমি বা তোমার বংশধর যাহার নিকট এই মুকুটাদি থাকিবে, সে শ্রীশ্রীযশোরেশ্বরী বিগ্রহের সম্মুখে কুলগুরুকে সাক্ষ্য রাখিয়া প্রত্যর্পণ করিবে। আমার আদেশ রক্ষা না করিলে নরকস্থ হইবে। অত্রসহ কয়েকটি মুদ্রা

রহিল। উহা তুমি বা তোমার উপযুক্ত বংশধর এই কার্যের পুরস্কারস্বরূপ পাইবে। সন ১০১৬ দশ শত ষোড়শ। শ্রীশ্রীকালী প্রসাদেন ভবতি শ্রীমন্মহারাজা প্রতাপাদিত্য।"

ডক্টর চৌধুরীর পড়া শেষ হলো।

নিস্তব্ধ হল-ঘর—একটা স্ঁচ পড়লেও বোধহয় শোনা যায়। কোথায় সেই সুদূর অতীত মহারাজ প্রতাপাদিত্যের যুগ আর কোথায় আজ বর্তমান! শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে সবাই যেন সেই প্রতাপাদিত্যের যুগে চলে গেছে।

শৈলেনবাবু চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

পুলিস সাহেব বললেন, "তাহলে এই সিন্দুকের মধ্যেই মহারাজা প্রতাপাদিত্যের রাজমুকুট আছে? অত্যদ্ভুত ঘটনা!"

বুলেট আবাব সিন্দুকের মধ্যে হাত ঢোকায়। গভীর আগ্রহে সবাই চেয়ে আছে। কাবো চোখের পাতাও বুঝি পড়ছে না। থমথম করছে হল-ঘর।

বুলেট একটা ছোট থলে বের করে টেবিলের উপর রাখতেই থলেটা ফেঁসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা মোহর ও রূপার মুদ্রা ছড়িয়ে পড়লো।

ললিত চৌধুরী কয়েকটি মুদ্রা তুলে নিয়ে কিছুক্ষণ পরীক্ষা করে বললেন, "মোহরগুলি পাঠান সুলতান দাউদ খাঁর সময়ের। কিন্তু ত্রিকোণ রূপার মুদ্রাগুলো কার সময়ের, তা বলা যায় না। শুনেছি, মহারাজ প্রতাপাদিত্য ত্রিকোণাকৃতি মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন। কিন্তু এগুলি এমন ক্ষয়ে গেছে যে উপরে কি লেখা ছিল, পড়া যাচ্ছে না।"

নিস্তব্ধ হল-ঘরে কেবল ওয়ালক্লকের পেন্‌ডুলামের শব্দ কানে আসছে। বুলেট এইবার সিন্দুকের ভিতর থেকে একটা বড় পুলিন্দা বের করলে। পুলিন্দাটা পুরু লাল রংয়ের মখমলের কাপড়ে জড়ানো। বহুকাল সিন্দুকের মধ্যে থেকে মখমলের রং নষ্ট হয়ে গেছে, কোন কোন জায়গা পোকায়ও কেটেছে। অতি জীর্ণ অবস্থা।

পুলিন্দাটা খুলতে বেশী সময় লাগলো না। মুহূর্তে ঝলমল করে উঠলো অপূর্ব এক বস্তু!

গভীর শ্রদ্ধায় ও বিস্ময়ে সবাই দেখলে, প্রায় চারশো বছর আগের তৈরী অথচ অপূর্ব কারুকার্যময় একটি স্বর্ণমুকুট, যা একদিন বাঙালী জাতির গৌরব মহারাজ প্রতাপাদিত্য চির-উন্নত শিরে পরেছিলেন।

মুহূর্ত মধ্যে নিস্তব্ধ হল-ঘর জয়োল্লাসে ফেটে পড়লো। আনন্দে গর্বে জয়ধ্বনি করে উঠলো সবাই। পুলিস সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। বললেন; "আসুন, বাংলার সেই মহাবীর সন্তান, স্বাধীনতাযুদ্ধের সেই মহানায়কের এই প্রতিভূকে আমরা অভিবাদন জানাই।"

শ্রদ্ধায় গর্বে সবাই উঠে দাঁড়ালো।